ঘাটু গানের সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট

এম.ফিল. গবেষণা অভিসন্দর্ভের সার-সংক্ষেপ

সুশান্ত কুমার সরকার

বাংলা বিভাগ,

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বাংলাদেশের ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, নেত্রকোনা ও সিলেটের হাওড় অঞ্চলে একসময় ঘাটু গানের ব্যাপক প্রচলন ছিল। এসব এলাকার স্থানীয় উৎসুক গ্রামবাসীর পৃষ্ঠপোষকতায় বেশ ঘটা করে ঘাটু গান পরিবেশিত হতো। এই গানের তুমুল জনপ্রিয়তার দরুন বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে ঘাটুর দল গঠিত হয়। লোকসঙ্গীতের অন্যান্য ধারার মত ঘাটু গানও বিলুপ্তপ্রায় প্রকরণ। উচ্চারণ ভেদে ভিন্ন হলেও জনপ্রিয়তার দরুন এ গান জনমনে শক্ত আসন বিস্তার গড়তে সমর্থ হয়।

ময়মনসিংহের পূর্বাঞ্চল ও টাঙ্গাইল অঞ্চলে ঘাটু গান – ঘাড়ু গান, গাড়ু গান এবং গাটু ইত্যাদি নামে বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে যখন ময়মনসিংহের পূর্বাঞ্চল এর বড় বড় হাওড়গুলো পানিতে ভরে থাকে এবং খুব কম সংখ্যক কৃষক কাজের সংস্থান পেয়ে থাকেন তখন অনুষ্ঠিত হয়। অবসর সময়টা তারা বাড়িতে বাড়িতে ঘাটু গান গেয়ে কাটিয়ে দেন। আবার বিভিন্ন মেলা ও অনুষ্ঠানের পাশাপাশি বছরের যে-কোন সময় কেউ চাইলেই এ গান পরিবেশন করতে পারে। প্রভাব ও প্রতিপত্তিশালী লোকজন ঘাটু গানের আয়োজন করে থাকেন। ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে অধিকাংশ কলাকুশলীই মুসলিম ধর্মাবলম্বী ও কৃষকশ্রেণীর। কিন্তু হিন্দু মুসলমান উভয় শ্রেণীর দর্শকই ঘাটু গানের আসরে দেখা যায়। ঘাটু গানের দলে একজন সরকার থাকেন যিনি গান, নাচ প্রশিক্ষণের পাশাপাশি দলে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। তারা গ্রামের দরিদ্রতার কষাঘাতে জর্জরিত পরিবারের কিশোর বয়েসী ছেলেদেরকে গান গাওয়ার জন্য চুক্তি করে নিয়ে আসেন। কিশোর বয়েসী ছেলেদেরকেই নাচ গান শিখিয়ে দক্ষ করে গড়ে তোলা হয় পরবর্তীতে যারা ঘাটু বা ছোকরা নামে পরিচিত হয়। যাদের ভরণপোষণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেন সরকার নিজে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যেত যে দলের সরকার কোন এক সময় ছোকরা ছিলেন। ময়মনসিংহ অঞ্চলে যখন ঘাটু গান খুব প্রচলিত ছিল তখন দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ছোট ছোট ছেলেদের ধরে এনে সরকারের কাছে বিক্রি করে দেয়া হতো খুব চড়া দামে। ফলে তারা পিতা মাতার কাছে ফিরে যেতে পারতো না। দক্ষ ছোকরাদের উপরে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সংঘর্ষও লেগে যেতো এবং খুনা খুনির ঘটনাও ঘটতো। তাই কখনও কখনও দক্ষ ছোকরার নিরাপত্তার জন্য দেহরক্ষীর ব্যবস্থা রাখা হতো। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ছোকরারা লুঙ্গি এবং লম্বা আলখেল্লা পড়ত। তাদের বেশ ভুষা ছিল অবিবাহিত নারীর মত। তারা মাথায় মুকুট, গলায় মালা, হাতে চুরি, পরচুলা, লিপস্টিক এবং পায়ে আলতা পড়ত। ঘাটু গানের অভিনয় সাধারণত বন্দনা দিয়ে শুরু হয়। ঘাটু গানের অভিনয় প্রহসন মূলক, সংলাপাত্তক ও প্রতিযোগিতামূলক।

বর্তমানে ঘাটু গানের কোন প্রতিষ্ঠিত দল না থাকলেও এর সাথে যারা এক সময় জড়িত ছিলেন তাদের অস্থিমজ্জায় মিশে আছে এ গান। যার প্রমাণ আমরা পাই সেই সব শ্রমজীবী মানুষের মাঝে যারা এক সময় বাধ্য হয়েছেন এ পেশা ত্যাগ করে অন্য পেশা গ্রহণ করতে। কোন সামাজিক প্রেক্ষাপটের কারণে এরা ঘাটু গানের দলে কাজ না করে ভিন্ন পেশায় যেতে বাধ্য হয়েছে তা আমরা খুঁজে পাই। এর মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে কি কারণে সমাজ থেকে জনপ্রিয় এই বিনোদন ধারা আজ লুপ্ত। অর্থাৎ কি বৈশিষ্ট্যর কারণে সমাজের সাধারণ আমজনতা এই জনপ্রিয় ধারার বিপক্ষে গিয়ে এটাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন সে সম্পর্কেও ধারণা পাই। এর মধ্যে দিয়ে আমরা দেখতে পাই যে সামাজিক বিনোদন মাধ্যমের সাথে সমাজের জনগণ, কোন সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে একে গ্রহণ বা বর্জন করে বা সামাজিক প্রথা ও কাঠামো কিভাবে একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। আমাদের দেশে কালীকাছ, সংযাত্রাসহ অন্যান্য পারফরমেঞ্চে নারীচরিত্র পুরুষেরা উপস্থাপন করে থাকেন। কিন্তু কালীকাছ ও সংযাত্রায় নারী চরিত্রে পুরুষের অভিনয় আর ঘাটু গানে নারী চরিত্রে পুরুষের অভিনয় সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। অনেক আলোচকের আলোচনা থেকে জানা যায় ঘাটু গানের দলের ঘাটুপুত্রের সঙ্গে নিজ দলের সরকার ও সমোজদারের যৌন সম্পর্ক থাকতো। কিন্তু

কালীকাছ ও সংযাত্রার অভিনয়ের সাথে যৌনতার কোন সম্পর্ক নেই। তাই সমাজে ঘাটু গান এবং সংযাত্রা ও কালী কাছের আপেক্ষিকতা ও গ্রহণযোগ্যতা আলাদা।

ঘাটু গানের সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছে গ্রামবাংলার সাধারণ জনতা। এ গানের শিল্পীরা জীবিকার তাগিদে নিজেদের বেঁচে থাকার স্বার্থে এ গানের সাথে সম্পৃক্ত থাকতো। তাই এর সাথে জড়িয়ে আছে আমাদের সমাজের এক শ্রেণীর মানুষের জীবনসংগ্রামের করুণ ইতিহাস এবং মানুষের জীবনধারণের পদ্ধতি ও সামাজিক, অর্থনৈতিক অবকাঠামো। কিন্তু সমাজের এই শ্রেণীর মানুষের জীবনধারণ ও তাদের পেশা নিয়ে অর্থাৎ ঘাটু গানের সাথে সম্পৃক্ত মানুষদের নিয়ে কাজ হয়নি বললেই চলে। তাই আমি মনে করি যে উক্ত কারণের আলোকে *ঘাটু গানের সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট* নিয়ে কাজ করাটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাসঙ্গিক।

বিলুপ্তপ্রায় লোক সঙ্গীতের এই প্রকরণটির মধ্যে দিয়েই তৎকালীন সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের জীবনযাত্রা, আর্থসামাজিক অবস্থান, সামাজিক প্রতিপত্তি ও আধিপত্য প্রকাশ পেত। ঘাটু গানের অন্যতম প্রধান চরিত্র হচ্ছে ঘাটু। দেখতে সুন্দর, নাচ গানে পারদর্শী ও অনেকটা মেয়েলি স্বভাবের অধিকারী সমাজের কিশোরেরাই এ চরিত্র রূপদান করতো। যাঁরা ঘাটু পালতেন তাঁদেরকে মানুষ সমাজের অন্যান্য মানুষের থেকে উচ্চ পর্যায়ের বলে অভিহিত করতেন। ঘাটুকে সবাই খুব সমীহ করতেন আবার ক্ষেত্র বিশেষে সমাজের অনেক মানুষের গঞ্জনার শিকারও হতে হত। অনেক অনেক ঘাটু ছিল তাদের গ্রামের অন্য সব মানুষের জন্য সম্মান ও গৌরবের পাত্র। ঘাটুর উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য অনেক সময় এক গ্রামের সঙ্গে অন্য গ্রামের মানুষেরা মারামারিতে লিপ্ত হতেন। এমনকি ঘাটুকে নিয়ে খুনাখুনি পর্যন্তও হয়ে যেত। কালের বিবর্তনে এ পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ বাধ্য হয়ে অন্য পেশা গ্রহণ করেছেন। এমনকি এদের মধ্যে অনেকেই কোন এক সময়ে যে এ গানের সাথে যুক্ত ছিলেন সে কথা পর্যন্ত স্বীকার করতে চান না। এর পিছনের অন্যতম কারণ হচ্ছে আমাদের বর্তমান কালের সমাজ ব্যবস্থা।

আমাদের ঐতিহ্যবাহী লোকসংস্কৃতির অন্যতম উপাদান হচ্ছে ঘাটু গান। এক সময়ে নেত্রকোনার বিভিন্ন গ্রামেগঞ্জে এ গানের ব্যাপক জনপ্রিয়তা ছিল। নেত্রকোনার পাশাপাশি সিলেটের গোটা হাওড় অঞ্চল ও পূর্ব ময়মনসিংহ অঞ্চলে এ গান প্রসারতা লাভ করে। ঘাটু গানের উচ্চারণ নিয়ে বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে। কোন কোন অঞ্চলে এ গান ঘাঁটু, ঘেটু, ঘেঁটু, গেন্টু, ঘাড়ু, গাড়ু, গাঁটু নামে প্রচলিত৷ ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা অঞ্চলে এ গান ঘাটু ও গাড়ু নামেই অধিল প্রচলিত। শিক্ষিত মহলে এ গান ঘাটু নামেই পরিচিত। আবার অক্ষর জ্ঞান হীন সাধারণ মানুষেরা একে গাড়ু নামেই ডেকে থাকেন। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে উক্ত অঞ্চলের মানুষেরা ট এর পরিবর্তে ড উচ্চারণ করে থাকেন, যেমন: মাটি> মাডি, ঘাট>গাট, দুইটা>দুইডা ইত্যাদি৷ ঠিক এমনি ভাবে ঘাটু থেকে গাড়ু শব্দের উৎপত্তি। কিন্তু বিভিন্ন কবি-সাহিত্যিক ও গবেষকদেরকে সাহিত্যের পাতায় একে ঘাটু নামেই উল্লেখ করতে দেখা যায়। ঘাটু গানের নামকরণের ইতিহাস সম্পর্কে বিভিন্ন পণ্ডিতবর্গ ভিন্ন ভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। সাধারণের ধারণা ঘাটে ঘাটে নৌকা ভিড়িয়ে এ গান গাওয়া হয় বলে এর নামকরণ করা হয়েছে ঘাটু গান। ঘাটু গান পরবর্তীতে ঘাটু যাত্রা নামেও পরিচিতি লাভ করেছিল। পণ্ডিত বর্গের মতে ঘাটু গানের সাথে যাত্রা শব্দটি যুক্ত হয়ে ঘাটুযাত্রা বা ঘেঁটু যাত্রার উৎপত্তি ঘটে। সচরাচার গীতি নৃত্যাশ্রিত যে কোন নাট্যের ক্ষেত্রে উনবিংশ শতাব্দী থেকে এদেশে যাত্রা কথাটি ব্যবহৃত হতে থাকে। যেমন মূলে রাম লীলা, উত্তরকালে রামযাত্রা এবং রামলীলা উভয় নামেই অভিহিত হতে থাকে।

ঘাটু গানে সাধারণত দুজন ঘাটুর সাথে দুইটি পক্ষ নিয়ে নাচ-গান পরিবেশন করা হয়। এক পক্ষ হচ্ছে রাই আর অন্য পক্ষ হচ্ছে শ্যাম। রাই চরিত্রে কিশোর বয়সের ছেলেরা মেয়েদের সাজ গ্রহণ করে অভিনয় করে আর শ্যাম চরিত্রে ছেলেরা নিজেদের অবস্থান থেকেই অংশগ্রহণ করে

। ঘাটু গানের ক্ষেত্রে একজন উস্তাদ থাকেন যিনি দলনেতার ভূমিকা পালন করেন। আর তার সঙ্গে থাকেন একাধিক পাইল বা দোহার যারা বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র বাজানো ও হাততালির মধ্যে দিয়ে গানের ধোয়া ধরেন। ঘাটু গানে সাধারণত ঢোল, করতাল, হারমোনিয়াম, মন্দিরা, চটি ও বিভিন্ন ধরনের লোকবাদ্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ঘাটু গানে দর্শকদের জন্য আনন্দের অন্যতম উৎস হল বাহার। বাদ্যযন্ত্রের তালের সাথে উচ্চস্বরের বাহার কিছুক্ষনের জন্য দর্শকদের মাতিয়ে তোলেন৷ বাহারে অংশ নেয় দোহার বা পাইলেরা।

ঘাটু গানের শুরু হয় বন্দনার মধ্যে দিয়ে। রাই চরিত্রের ঘাটু আসরে এসে প্রথমে উস্তাদ ও পর্যায়ক্রমে দর্শক ও অন্যান্যদের সাথে করমর্দন করে বন্দনা পরিবেশন করে৷ বন্দনার শেষে রাই নিজের পরিচয় জ্ঞাপক গান পরিবেশন করে শ্যামের উদ্দেশ্যে প্রশ্নমূলক গান পরিবেশন করে। যেমন-

রাই: শ্যাম বলি যে তোরে

যেদিন মায়ের গর্ভে ছিলে

সেইদিন খাইছ কী৷

দোহার: শ্যাম বলি যে তোরে

ওরে জানলে কথা

বইল-অ আমারে

একটি কথা প্রশ্ন করি তোরে।।

রাই: শ্যাম বলি যে তোরে

কোন দিঘিতে বইসা আর

শুইয়া ছিলে

শিথান দিছস কী ?

এর মধ্যে দিয়ে রাই গানে গানে প্রশ্ন করে আসরে বসে যাবে। তারপর শ্যাম উঠে প্রথমে বন্দনা ও পরে পরিচয়মূলক গান পরিবেশন করে রাইয়ের দেয়া প্রশ্নের উত্তর দিবে। আর এভাবেই প্রশ্ন উত্তরের মধ্যে দিয়ে ঘাটু গান জমে উঠে। মূলধারার ঘাটু গানের ফাঁকে ফাঁকে দর্শকদের আনন্দ দেবার জন্য পরিবেশন করা হয় আনন্দমূলক গান। আর এই গানের সাথে যে নাচ পরিবেশন করা হয় তা খেমটা নামে পরিচিত। আনন্দমূলক কয়েকটি গানের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে- ১.

রাই: কে দিল পিরিতের বেড়া লিচুরও বাগানে।

ছোট ছোট লিচুগুলি

বন্ধু তুলে আমিও তুলি

বন্ধু দেয় আমার মুখে

আমি দেই বন্ধুর মুখে।।

২.

রাই: ভাইসাবরে তুই জলে ভাসা

সাবান কিন্যা দিলি না ।।

সাবান কিন্যা দিলি নারে ।।

যুদি কর আমার আশা

সাবান আইনো জলে ভাসা

নইলে থাকবে মন ভাসা

আমার দেখা পাইবে না ।।

ঘাটু গানের সবার শেষে পরিবেশিত হয় কৃষ্ণ সন্ন্যাস। এই অংশের পর আর কোন ঘাটু গান পরিবেশন করা হয় না। কৃষ্ণ সন্ন্যাসের মধ্যে দিয়ে মূলত ঘাটু গানের পরিসমাপ্তি টানা হয়। ঘাটু গানের পংক্তি সংখ্যা সাধারণত চার থেকে ছয় এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এর মধ্যেই মূলভাব ও সারকথা প্রকাশ পায়। ঘাটু গানের শিল্পীরা গ্রামের সাধারণ মানুষ। তারা বিভিন্ন শ্রেণী পেশার সাথে সম্পৃক্ত। তারা তাদের নিত্য দিনের অভাব অনটনের পরও ঘাটু গানের মধ্যে দিয়ে নিজেরা যেমন মজা পান তেমনি অন্যান্য দর্শকদেরকেও বিনোদন প্রদান করে থাকেন। ঘাটু গান সাধারণত কার্ত্তিক মাস থেকে অগ্রহায়ণ-পৌষ মাস পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ঘাটু গানের দর্শকেরাও সাধারণ শ্রেণী পেশার খেটে খাওয়া মানুষ। তারা নিজেদের কাজের অবসর সময়টুকুতে ঘাটু গানের আসরে এসে আনন্দ উপভোগ করে থাকেন।

ঘাটু গানের মধ্যে দিয়েও আমরা দেখতে পাই যে নারী দেহের বহিরঙ্গ সৌন্দর্যের প্রতি অধিকতর গুরত্ব প্রদান করা হয়। ঘাটু ছোকরা নারীকে উপস্থাপনের জন্য মাথার চুল বড় রাখে এবং অনেকাংশে বিভিন্ন অলংকার পরিধান করার জন্য কান ছিদ্র রাখে। মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে গিয়ে এ রকম একজন ঘাটু শিল্পী আনারকলিকে (ছদ্ম নাম) পাওয়া যায় যিনি এ গান পরিবেশন করার জন্য কানে ছিদ্র করেছেন। এ গানের মধ্যে দিয়ে যে নারীদের উপস্থাপন করা হয় তারা বিভিন্নভাবে সমাজ দ্বারা বঞ্চিত।

ঘাটু গানেও আমরা নারীকে অনেকটা অক্রিয় ও পুরুষের উপর নির্ভরশীল হিসেবেই দেখতে পাই। ঘাটু গানের মধ্যে আমরা রাধা কৃষ্ণের বিরহের মধ্যে দিয়ে মূলত বাঙালি সমাজের সাধারণ নারীদের বিরহের প্রতিমূর্তি খুজে পাই। এখন পর্যন্ত আমাদের সমাজে নারীরা পুরুষকে তাদের জীবনের সুভ্রতা ও পবিত্রতার প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন। রাধার কাছে তাঁর কৃষ্ণ প্রদীপের মতই শুভ্র। যতদিন কৃষ্ণ বৃন্দাবনে ছিলেন ততদিন রাধা তাদের মিলনস্থলে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালাননি। ছেড়ে যাবার পর থেকেই কৃষ্ণকে স্মরণ করে রাধা প্রতিদিন সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালাতেন। তাঁর জীবন থেকে যে প্রদীপ নিভে গেছে তা আর ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়। তাই কৃষ্ণের প্রতীক হিসেবে বাকী জীবনের প্রতি সন্ধ্যায় বৃন্দাবনে প্রদীপের মাধ্যেমে আলো জ্বালিয়েছেন। বাঙালি সমাজেও সন্ধ্যা হলে ঘরে প্রদীপ জ্বালানোর যে রীতি তা এখান থেকে এসেছে বলে অনেকে মনে করেন। রাধার দুঃখের সাথে একীভূত হয়ে বাঙালি প্রাণও কেদে চলেছে প্রবাহমান নদীর মত। রাধা চেয়েছেন তাঁর মনের জ্বালা সন্ধ্যাপ্রদীপের আলোয় মিশে দিগন্তে ছড়িয়ে যাক। জ্বালাকে ভালবাসায় রূপান্তরিত করার এই যে বাঙালি রীতি তা এদেশের লোকসাহিত্যের ঐতিহ্যের ধারক ও সাহিত্যিকদের খোরাক জুগিয়ে চলছে।

রাধার মত করে সহস্র বাঙালিও সন্ধ্যাপ্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যে দিয়ে তাদের প্রিয়জনের শুভ্রতা অনুভব করে থাকেন।

এক সময় বাঙলার অভিনয়ে নারী চরিত্র উপস্থাপনে পুরুষেরাই অংশগ্রহণ করতো। আমাদের দেশের ঐতিহ্যবাহী সংযাত্রা ও কালিকাছ এর উৎপত্তির সময় থেকেই উক্ত প্রযোজনাগুলোতে নারী চরিত্র উপস্থাপনে পুরুষেরা অংশগ্রহণ করে আসছেন। এর পাশাপাশি লেটো গান, তামসা বা মাইট্যা তামাসা, ঘাটু গান ও অষ্টক গানসহ কয়েক ধরনের যাত্রায় অল্প বয়স্ক কিশোর যুবারাই নারী চরিত্র উপস্থাপন করে থাকে।

আমাদের দেশের লোক নাটকের অভিনয়ের ক্ষেত্রে অনেকাংশে নারী চরিত্র উপস্থাপনে পুরুষেরা অংশ গ্রহণ করে থাকেন। বর্তমানকালেও বাংলাদেশের লোকনাট্যের কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্ত্রী ভূমিকায় পুরুষ কুশীলব অভিনয় করে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ রাজশাহী অঞ্চলের 'আলকাপ', ময়মনসিংহ অঞ্চলের 'ব্যইদ্যানির [যদৃষ্টং] গান' বা 'মাইট্যা তামশা' ও 'ঘাটু গান' এবং রংপুর অঞ্চলের 'ছোকরা নাচ' ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা যায়। এসকল অভিনয়- অনুষ্ঠান (Performence) এ পুরুষ কুশীলব অভিনয় ও নাচের পাশাপাশি গানও গেয়ে থাকেন। কুশীলবদের বয়স ১৪ বছরের কাছাকাছি, এরা শাড়ি ও লম্বা পরচুলা ব্যবহার করেন অথবা ক্ষেত্র বিশেষে বড় চুল রাখেন। ঘাটু গানে সাধারণত, চার থেকে পাঁচ জন ছেলে সমবেত গান ও বাজনার সাথে নেচে গেয়ে মুকাভিনয় ঢঙে চরিত্রাভিনয় করে চলে। এসময় তারা যেসব গানগুলো পরিবেশন করে সেগুলো মূলত আদি রসাত্মক। এসকল অভিনয় ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত না হলেও এর মূল বিষয় হয়ে থাকে রাধা-কৃষ্ণের উপাখ্যানকে কেন্দ্র করে। নাচ ও গানে পারদর্শী ছেলেদেরকে ঘাটু দলে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রচুর চাহিদা দেখা যায়। এসমস্ত ছেলেদেরকে ঘাটু দলের দলনেতা, যিনি দলের প্রাক্তন অভিনেতাও বটেন, তিনি তাদেরকে তালিম দেন এবং এর বিনিময়ে মাসিক মাসোহারা প্রদান করেন।

ঘাটু গানের মত পরিবেশনা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত 'ছোকরা নাচ' ধর্মীয় আচার সম্পর্কিত না হলেও তার আদিরসাত্মক আবেদনের জন্য বিখ্যাত। *ময়মনসিংহ গীতিকার* 'মহুয়া' উপাখ্যানের উপর ভিত্তি করে পরিবেশিত বাইদ্যানির গানে 'সং নাচ' অন্তর্ভুক্ত এবং নারী ভূমিকায় পুরুষ কুশীলব অংশগ্রহণ করে থাকেন। প্রায় আশি বছর আগে পদ্মার পূর্বপারের বাংলায় বাইদ্যানির গান ছিল ব্যাপকভাবে সমাদৃত।

ইতিহাসের পাতা থেকে আমরা জানতে পারি যে, বাংলার অভিনয়ে নারী ও পুরুষের অংশীদারিত্ব কোন অংশেই কম নয়। পুরুষের পাশাপাশি নারীরা সব সময়ই কোন না কোন ভাবে অভিনয়ের সাথে যুক্ত থাকার জন্য সচেষ্ট ছিল, কিন্তু সমাজ ও বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতা তাদের সে পথকে থমকে দিয়েছে।

অতি প্রাচীনকাল থেকেই আফগানিস্থানে এক প্রচলিত বিকৃত শিশু (যৌন) নির্যাতনের সংস্কৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। আর এই উল্লিখিত শিশু যৌনাচার বাচ্চাবাজি নামে পরিচিত। বাচ্চা বাজি এর আক্ষরিক অর্থ করলে ইংরেজীতে বলতে হয় 'Boy Play' আর বাংলায় যাকে আমরা বাচ্চা বাজি হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারি। আমাদের দেশে প্রচলিত ঘাটু গানের মতই টাকার বিনিময়ে কিনে নেয়া এই ছেলেগুলোর নতুন মনিব (Master) নিয়ন্ত্রণ করে এদের জীবনের সবকিছুই।

ঐতিহ্যবাহী চাইনিজ থিয়েটারেও আমরা নারী চরিত্র উপস্থাপনে পুরুষের অংশগ্রহণ দেখতে পাই। চাইনিজ মেল ডানের জন্য যে সব বালকদের ব্যবহার করা হত তাদের দেখতে সুন্দর ও স্বভাব চরিত্রের মধ্যে মেয়েলী স্বভাব খোঁজা হত। ঘাটু গানের ক্ষেত্রেও এরকম বালকদের প্রাধান্য দেয়া হত। তারপর বিভিন্নভাবে মহড়ার মধ্যে দিয়ে নাচ গানে পারদর্শী করে তোলা হত। এর পর দেখা যেত যে দলের এক বা একাধিক সদস্য ঘাটু বালকের সাথে অভিনয় বহির্ভূত যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হত।

জাপানি কাবুকি ও নো নাটকে যে নারী চরিত্রের উপস্থাপন দেখা যায় সেখানে আমদের দক্ষিণ এশিয়ার লোকনাট্যধর্মী অভিনয় পদ্ধতি অর্থাৎ নারী চরিত্র উপস্থাপনে পুরুষেরা অংশগ্রহণ করেন। নো ও কাবুকি মূলত বুদ্ধেরই আরাধনামূলক প্রার্থনা সূচক নাট্যপ্রক্রিয়া।

ভারতীয় খেয়ালেও আমরা দেখতে পাই যে সেখানে নারী চরিত্র পুরুষ কুশীলববৃন্দের দ্বারা উপস্থাপন করা হয়।

ভারতীয় খেয়ালে আমরা যে নারী চরিত্র উপস্থাপনে পুরুষের অংশগ্রহণ দেখতে পাই- তার প্রেক্ষাপট চাইনিজ মেইল ডান, জাপানি আন্নাগাতা বা আফগানিস্থানের বাচ্চাবাজির মত নয়। খেয়াল ব্যতিত আলোচ্য অনান্য উপাদানগুলোতে নারী চরিত্র উপস্থাপনে পুরুষ কুশীলবদের সাথে যৌনতার সম্পর্ক রয়েছে। যা আমাদের দেশের ঘাটু গানের শিল্পীদের সাথে সম্পৃক্ত। আমাদের দেশের ঘাটু গানে যে কিশোরেরা ঘাটু সেজে নাচ গান করতে বাধ্য হতো এর সাথে আফগানিস্থানের বাচ্চাবাজিতে ব্যবহৃত কিশোরদের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটের হুবুহু মিল পাওয়া যায়। এরা প্রত্যেকেই তাদের জীবিকার তাগিদে নিজেদের ইচ্ছায় বা পরিবারের চাপে এই পেশায় যেতে বা অংশগ্রহণ করতে বাধ্য হয়। উপরে আলোচ্য উপাদানগুলির সাথে যৌনতার সম্পর্ক থাকলেও উক্ত উপাদানগুলি নিজস্ব শিল্প আঙ্গিক হিসেবে বিশ্বদরবারে (বিশেষ করে কাবুকি ও নো) অত্যন্ত সুনামের সাথে টিকে আছে। আমাদের জাতি হিসেবে ব্যর্থতা এটাই যে, যৌনতার অপবাদ দিয়ে আমরা ঘাটু গানকে সমাজের সাধারণ শ্রেণি-পেশার মানুষের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছি। অন্যান্য দেশের মত করে আমরা এটাকে শিল্পের আসনে এর পোক্ত অবস্থান সৃষ্টি করতে পারি নি। যেটা জাতি হিসেবে আমদের জন্য অত্যন্ত বেদনা, অপমান ও কষ্টের।

শত চেষ্টা করলেও লোকজ সংস্কৃতির সাথে বাঙালির যে প্রাণের বন্ধন রয়েছে তা ছিন্ন করা যাবে না। তাই বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায়ও কোন ভাবেই আমরা লোক আচার আচরণ থেকে বের হয়ে আসতে পারিনি। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে লোকজবিশ্বাস তথা লোকজ সংস্কৃতি। সংযাত্রা, কালীকাছ, মহিষাসুর বধ, বাইদ্যানির গান, শিব গৌরীর নাচসহ অন্যান্য লোকজ সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানে আমারা নারীদের উপস্থিতি দেখতে পাই। কালীকাছ, মহিষাসুর বধ ও শিব গৌরীর নাচ সাধারণত ধর্মীয় প্রার্থনার অংশ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। এখানে অভিনয়ে অংশগ্রহণকারীরা নিজেকে ছাপিয়ে দেবত্বের পর্যায়ে উপনীত হন। সর্বোপরি উপরোক্ত সাংস্কৃতিক উপাদানে পুরুষের নারী হিসেবে অংশগ্রহণ আর ঘাটু গানে নারী হিসেবে পুরুষের অংশগ্রহণ এক কথা নয়। ঘাটু গানে আমরা দেখতে পাই যে অনেক ক্ষেত্রে ঘাটু ছেলের সাথে দলের অধিকর্তা বা অন্যান্য অভিনেতাদের সাথে অভিনয় বহির্ভূত সম্পর্ক থাকতো। সমাজের সব মানুষ একে ভাল চোখে দেখত না। ফলে অনেক মানুষের নিকট এর গ্রহণযোগ্যতা অস্পৃশ্যতার পর্যায়ে পৌঁছেছিল৷ তাই যাদের অস্থিমজ্জায় মিশে আছে এই গান তারাও আজ সমাজের লোক চক্ষুর ভয়ে নিজেদেরকে এ গান থেকে গুটিয়ে নিচ্ছেন৷ যদিও তারা অভিনয় বহির্ভূত অন্য সম্পর্কের সাথে যুক্ত নন।

যৌনবাদী রাজনীতির আলোকে কেট মিলেট আমাদের সমাজের পিতৃতন্ত্রকে খুব নিখুত ভাবে তুলে ধরেছেন। ঘাটু গানের মধ্যেও আমরা কেট মিলেটের যৌনবাদী রাজনীতির উপস্থাপন দেখতে পাই। সমাজে পিতৃতন্ত্র নিম্নোক্ত উপায়ের মধ্যে দিয়ে তার পুরুষালি আধিপত্যকে তুলে ধরে। যথা: ১. ভাবাদর্শগত, ২. শ্রেণীগত, ৩. জীববিজ্ঞান সংক্রান্ত, ৪. সমাজবিদ্যা বিষয়ক, ৫. অর্থনৈতিক, ৬.বল প্রয়োগ, ৭. নৃতাত্ত্বিক- পুরাণ ও ধর্ম এবং ৮. মনস্তাত্ত্বিক।

উপরে আলোচ্য পুরুষালি আধিপত্যর ধারার প্রায় প্রত্যেকটিরই প্রকাশ ঘাটু গানের মধ্যে কোননা কোন ভাবে প্রতিফলিত হয়। ভাবাদর্শ গত জায়গা থেকে পিতৃতন্ত্র সম্মতি আদায়ের মধ্যে দিয়ে তার আধিপত্যকে তুলে ধরে। ঘাটু গানের অন্যতম চরিত্র রাই ও শ্যামের মধ্যে খুব সূক্ষ্ম ভাবে এর প্রভাব আমরা দেখতে পাই। এখানেও অত্যন্ত সুকৌশলে পিতৃতন্ত্রকে তুলে ধরা হয়।

ঘাটুতে উপস্থাপিত রাই চরিত্রের মধ্যে এর প্রকাশ দেখা যায়। ঘাটু গানের কথা ও নৃত্যের মধ্যে আমরা রাই ও শ্যাম উভয় চরিত্রের মধ্যেই জেন্ডার এর অভিকরণশীলতার উপস্থিতি দেখতে পাই। আর তখন দেখা যায় যে তাদের মধ্যেকার নারী ও পুরুষ সুলভ আচরণ সব সময় স্থিত নয়। মাঝে মাঝে শ্যামের মাঝে নারী সুলভ ও রাই এর মাঝে পুরুষ সুলভ আচরণও পরিলক্ষিত হয়। প্রচলিত পিতৃতন্ত্রের আলোকে আমরা দেখতে পাই যে, আমাদের সমাজে নারীর থেকে পুরুষেরা অধিকতর সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। কিন্তু ঘাটু গানের ক্ষেত্রে পুরুষালী ও নারী সুলভ আচরণের আলোকে বলতে পারি যে- এ গানে উপস্থাপিত রাই শ্যামের থেকে অনেক সক্রিয়। নাচ ও গানের অনেক ক্ষেত্রেই শ্যামের থেকে রাই –এর ভূমিকা অগ্রগণ্য। অর্থাৎ ঘাটু গানেও জেন্ডারের ধারণা কোথাও স্তিত নয়। ঘাটু গানে উপস্থাপিত বিভিন্ন বিষয়াবলী ও চরিত্র গুলোর আলোকে আমরা দেখতে পাই জেন্ডার সম্পর্কিত জুডিথ বাটলারের দেয়া তত্ত্ব এখানে ক্রিয়াশীল। অর্থাৎ ঘাটু গানে জেন্ডার এর অভিকরণশীলতার বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

নারীকে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে যে সাংস্কৃতিক কৌশল অবলম্বন করা হয় তা আমাদের দেশে বৈচিত্রময়। আমাদের লোকজ সংস্কৃতিতে যে নারীকে তুলে ধরা হয় তা বাস্তবিক অর্থেই হয়ে ওঠে লোক কবির আবেগ মিশ্রিত অন্তরের ভালবাসা ও পরশে তৈরি সুনিপুণ প্রতিমা।

ঘাটু গানের মত চাইনিজ মেল ডান, জাপানি আন্নাগাটাসহ অন্যান্য যে সব সাংস্কৃতিক উপাদানে নারী চরিত্র পুরুষ কুশীলববৃন্দের দ্বারা উপস্থাপন করা হয় সেখানে অভিনেতারা প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে শিক্ষা গ্রহণের মধ্যে দিয়ে তাদের চরিত্র উপস্থাপন করে থাকেন। আমাদের ঘাটু গানেও দেখা যায় যে ঘাটু ছোকরাকে ঘাটু দলের অধিকর্তা, যিনি সরকার বা ক্ষেত্র বিশেষে মরাদার নামে পরিচিত তিনি দীর্ঘ দিন গান ও নৃত্যের সাথে তালিম দিয়ে তাকে ঘাটু গানের জন্য উপযোগী করে তোলেন। আমার গবেষণা কাজের জন্য মাঠ পর্যায়ে মহড়া ও অন্যান্য কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ, তথ্যচিত্র গবেষণা এবং একান্তে গভীর সাক্ষাৎকারের মধ্যে দিয়ে যাদের নিকট থেকে সহযোগিতা নিয়েছি তার আলোকে কয়েকজন ঘাটু শিল্পী ও সখীনদারদের সাথে কথা বলে অর্জিত অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ কিছু তথ্য তুলে ধরছি।

ঘাটু গানের সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট প্রসঙ্গে আমার গবেষণার অনুকল্প হিসেবে আমি নির্ধারণ করেছিলাম যে, এখানে অভিনেতা তার চরিত্র উপস্থাপনে অতিমাত্রা যুক্ত করেন এবং আর্থসামাজিক কাঠামোর দ্রুত পরিবর্তনশীলতা ও আকাশ সংস্কৃতির বিকাশ এর বিলুপ্তির অন্যতম কারণ। মাঠ পর্যায়ে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করে বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে দেখা যায় যে ৪৩ ও ৪৪ নং প্রশ্নের আলোকে ৮৫% তথ্যদাতা এর স্বপক্ষে মতামত তুলে ধরেছেন। অপরদিকে ১৫% তথ্যদাতা এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেছেন। আলোচনার সাপেক্ষে আমরা বলতে পারি যে ঘাটু গানে নারী চরিত্র উপস্থাপনে পুরুষ কুশীলববৃন্দ তার লিঙ্গ ভিত্তিক আচরণে অতিমাত্রা যুক্ত করেন এবং সমাজের বহুস্তরায়িত সমস্যার দরুন এ গানের সাথে যুক্ত কলাকুশলিরা নিজেদেরকে গুটিয়ে রেখেছেন। আমাদের জন্য চরম দুর্ভাগ্য ও হাতাশার বিষয় এটাই যে, আমারা ঘাটু গানে নারী চরিত্র উপস্থাপনে পুরুষের অংশগ্রহণকে উচু মাপের শিল্প হিসেবে মেনে নিতে পারিনি।

ঘাটু গান একসময় আমাদের গ্রাম বাংলার মানুষের অস্তিত্বের সাথে মিশে ছিল। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় আজ তা ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। ঘাটু গানের সাথে যৌনতার সম্পর্কের দোহাই দিয়ে এ গানের শিল্পীদের সামাজিক ও পারিবারিক ভাবে হেয় পতিপন্ন করা হয়। যার ফলে তারা নিজেদের ইচ্ছা থাকা স্বত্বেও এ গান থেকে দূরে সরে আছেন। এ গানের প্রতি মানুষের সুদৃষ্টি ফিরে আসলে আমরা বাংলার এক সময়ের ঐতিহ্যবাহী এই লোকজ সংস্কৃতির উপাদানকে পুনঃরুজ্জিবীত করতে পারি। যে অপবাদ দিয়ে এ গানকে সমাজ থেকে দূরে রাখার অপকৌশল

গ্রহণ করা হয় তা আমাদের সমাজের বিভিন্ন মহলে বিভিন্ন ভাবে প্রচলিত, এ সম্পর্কে আমরা সকলেই অবগত। কিন্তু আমরা সেখানে গিয়ে এর প্রতিবাদ করি না। অভিনয় এর পর মানুষের ব্যক্তিক জীবনকে আমরা ভিন্ন করে দেখতে ভয় পাই।

ঘাটু গানের সাথে যারা যুক্ত আছেন তাদের সাথে কথা বলে আমি জানতে পারি যে, তারা শুধু বিনোদনের তাগিদেই মনের খোরাক জোটানোর জন্য এ গানের সাথে যুক্ত আছেন। পূর্বে এ গানের শিল্পীদের সাথে অন্যান্য অভিনেতার অভিনয় বহির্ভূত সম্পর্ক থাকলেও এটা এখন তাদের মাথা ব্যথার কারণ নয়। তারা শুধু বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে এর সাথে সম্পৃক্ত থাকতে চান। কিন্তু সমাজের মানুষের দৃষ্টি ভঙ্গির কারণে তা হয়ে ওঠে না। তাই আমরা দেখতে পাই যে, চীন ও জাপানের নারী চরিত্র উপস্থানকারী শিল্পীরা তাদের কৈশর ও যৌবন পদার্পণ করার পর ও একই চরিত্রে অভিনয় করে থাকেন।

ঘাটু গানের সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট

এম.ফিল. গবেষণা অভিসন্দর্ভ

সুশান্ত কুমার সরকার

বাংলা বিভাগ,

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঘাটু গানের সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট

এম.ফিল. গবেষণা অভিসন্দর্ভের জন্য উপস্থাপিত।

সুশান্ত কুমার সরকার

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নোক্ত স্বাক্ষরকারী বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ***ঘাটু গানের সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট*** শিরোনামে এম.ফিল. গবেষণা অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপন করলাম। অভিসন্দর্ভটি আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক **ড. রফিকউল্লাহ খান**, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর প্রত্যক্ষ নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভটির দ্বৈতয়ীক সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য, সংকলিত স্থলে উল্লিখিত তথ্য-উপাত্ত ব্যতিত অবশিষ্ট উপস্থাপন, বিশ্লেষণ ও বিরচনা আমার নিজস্ব।

.....

সুশান্ত কুমার সরকার

অনুমোদনপত্র

বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এম.ফিল. গবেষক **সুশান্ত কুমার সরকার** (HA-171) আমার তত্ত্বাবধানে ***ঘাটু গানের সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট*** শিরোনামে যে এম.ফিল. অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপন করেছে, তা তাঁর একক ও মৌলিক গবেষণার ফসল। অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ দিকনির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করা হয়েছে। গবেষককে তাঁর এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপনের জন্য অনুমতি প্রদান করা হল।

.....

স্বাক্ষর

তত্ত্বাবধায়কের নাম:

ড. রফিকউল্লাহ খান

পদবী: অধ্যাপক

তারিখ:

সারসংক্ষেপ

এক সময় বাংলাদেশের ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, নেত্রকোনা ও সিলেটের হাওড়াঞ্চলে ঘাটু গানের ব্যাপক প্রচলন ছিল। এসব এলাকার স্থানীয় উৎসুক গ্রামবাসীর পৃষ্ঠপোষকতায় বেশ ঘটা করে ঘাটু গান পরিবেশিত হতো। এই গানের তুমুল জনপ্রিয়তার দরুন বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে ঘাটুর দল গঠিত হয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও এটা সত্য যে লোকসঙ্গীতের অন্যান্য ধারার মত ঘাটু গানও বিলুপ্তপ্রায় প্রকরণ। ঘাটু গানের উচ্চারণ নিয়ে অঞ্চলভেদে ভিন্নতা রয়েছে। কোথাও কোথাও শব্দটিকে ঘাঁটু, ঘেটু, ঘেঁটু, গেন্টু, ঘাড়ু, গাঁড়ু বা গাঁটু নামে অভিহিত করা হয়। নেত্রকোনা অঞ্চলে এই গান ঘাটু ও গাড়ু নামেই বেশি প্রচলিত। শিক্ষিত মহলে এই গান ঘাটু নামেই অধিক প্রচলিত। উচ্চারণ ভেদে ভিন্ন হলেও জনপ্রিয়তার দরুন এ গান জনমনে শক্ত আসন বিস্তার গড়তে সমর্থ হয়।

ময়মনসিংহের পূর্বাঞ্চল ও টাঙ্গাইল অঞ্চলে ঘাটু গান, ঘাড়ু গান, গাড়ু গান এবং গাটু ইত্যাদি নামে বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে যখন ময়মনসিংহের পূর্বাঞ্চল এর বড় বড় হাওড়গুলো পানিতে ভরে থাকে এবং খুব কম সংখ্যক কৃষক কাজের সংস্থান পেয়ে থাকেন তখন অনুষ্ঠিত হয়। অবসর সময়টা তারা বাড়িতে বাড়িতে ঘাটু গান গেয়ে কাটিয়ে দেন। আবার বিভিন্ন মেলা ও অনুষ্ঠানের পাশাপাশি বছরের যে-কোন সময় কেউ চাইলেই এ গান পরিবেশন করতে পারে।

প্রভাব ও প্রতিপত্তিশালী লোকজন ঘাটু গানের আয়োজন করে থাকেন। ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে অধিকাংশ কলাকুশলীই মুসলিম ধর্মাবলম্বী ও কৃষকশ্রেণীর। কিন্তু হিন্দু মুসলমান উভয় শ্রেণীর দর্শকই ঘাটু গানের আসরে দেখা যায়। ঘাটু গানের দলে একজন সরকার থাকেন যিনি গান, নাচ প্রশিক্ষণের পাশাপাশি দলে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। তারা গ্রামের দরিদ্রতার কষাঘাতে জর্জরিত পরিবারের কিশোর বয়েসী ছেলেদেরকে গান গাওয়ার জন্য চুক্তি করে নিয়ে আসেন। কিশোর বয়েসী ছেলেদেরকেই নাচ গান শিখিয়ে দক্ষ করে গড়ে তোলা হয় পরবর্তীতে যারা ঘাটু বা ছোকরা নামে পরিচিত হয়। যাদের ভরণপোষণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেন সরকার নিজে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যেত যে দলের সরকার কোন এক সময় ছোকরা ছিলেন। ময়মনসিংহ অঞ্চলে যখন ঘাটু গান খুব প্রচলিত ছিল তখন দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ছোট ছোট ছেলেদের ধরে এনে সরকারের কাছে বিক্রি করে দেয়া হতো খুব চড়া দামে। ফলে তারা পিতা মাতার কাছে ফিরে যেতে পারতো না। দক্ষ ছোকরাদের উপরে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সংঘর্ষও লেগে যেতো এবং খুনা খুনির ঘটনাও ঘটতো। তাই কখনও কখনও দক্ষ ছোকরার নিরাপত্তার জন্য দেহরক্ষীর ব্যবস্থা রাখা হতো। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ছোকরারা লুঙ্গি এবং লম্বা আলখেল্লা পড়ত। তাদের বেশ ভুষা ছিল অবিবাহিত নারীর মত। তারা মাথায় মুকুট, গলায় মালা, হাতে চুরি, পরচুলা,

লিপস্টিক এবং পায়ে আলতা পড়ত। ঘাটু গানের অভিনয় সাধারণত বন্দনা দিয়ে শুরু হয়। ঘাটু গানের অভিনয় প্রহসন মূলক, সংলাপাত্তক ও প্রতিযোগিতামূলক।

সূচিপত্র

ভূমিকা	১০-৩০

প্রথম অধ্যায়: গবেষণা অঞ্চল পরিচিতি	৩১-৪০

১.১ ভূমিকা

১.২ গবেষণা অঞ্চলের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

১.৩ গবেষণা অঞ্চলের ভৌগোলিক বিবরণ

১.৪ গবেষণা অঞ্চলের সাংস্কৃতিক রূপরেখা

১.৫ উপসংহার

দ্বিতীয় অধ্যায়: ঘাটু গানের প্রেক্ষাপট	৪১-৬২

২.১ ঘাটু গানের বিষয়বস্তু ও সামাজিক প্রেক্ষাপট

২.২ ঘাটু গানে শিল্পীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান

২.৩ ঘাটু গানের মধ্যে দিয়ে সমাজে নারীর প্রতিরূপায়ণ

২.৪ হুমায়ূন আহমেদের ঘেটুপুত্র কমলা ও তৎকালীন আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা

তৃতীয় অধ্যায়: ঘাটু গানে নারী শিল্পী	৬৩-৭২

৩.১ পুরুষ কুশীলববৃন্দের দ্বারা অভিনীত নারী চরিত্র

৩.২ বাংলাদেশের অভিনয়ে নারী শিল্পীদের আর্থ-সামাজিক জীবন

চতুর্থ অধ্যায়: দেশী সাংস্কৃতিক উপস্থাপনার (পারফরমেন্স) সঙ্গে ঘাটু গানের তুলনা	৭৩-৮৪

৪.১ সংযাত্রা

৪.২ কালিকাছ

৪.৩ মহিষাসুর বধ

পঞ্চম অধ্যায়: বিদেশী সাংস্কৃতিক উপস্থাপনার (পারফরমেন্স) সঙ্গে ঘাটু গানের তুলনা ৮৫-৯৩

৫.১ বাচ্চাবাজী

৫.২ মেইল ডান

৫.৩ আন্নাগাতা

৫.৩ ভারতীয় খেয়াল

ষষ্ঠ অধ্যায়: উপস্থাপনার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ৯৪-১২৬

৬.১ ঘাটু গানের তাত্ত্বিক আলোচনা

৬.২ প্রশ্নপত্র অনুসারে তথ্য বিশ্লেষণ

৬.৩ চরিত্র উপস্থাপনে সাংস্কৃতিক কৌশল

৬.৪ উপস্থাপনা কৌশল ও সামাজিক মূল্যায়ন

উপসংহার ১২৭

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ১২৮-১৩৩

ভূমিকা

গবেষণার প্রেক্ষাপট

পুস্তক পর্যালোচনা

গবেষণার যৌক্তিকতা

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

গবেষণার রীতি ও পদ্ধতি

সুপারিশমালা

ভূমিকা:

আমাদের লোকসাহিত্যের অন্যতম উপাদান হচ্ছে ঘাটু গান। ঘটু গান নিয়ে আলোচনার পূর্বে তাই লোকসাহিত্যের পরিসর নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করতে চাই। ইসলাম (১৯৬৭) বলেন, ফোকলোর হোল সেই সমস্ত উপকরণ যেগুলো ঐতিহ্যের মধ্যে দিয়ে আমাদের হস্তগত করতে হয় — হস্তগত হয় মুখে, মুখে, আচার ব্যবহারের মারফৎ কিংবা আয়ত্ব করতে হয় চেষ্টা প্রসূত অনুসরণ পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে। এটা হতে পারে লোকসঙ্গীত, লোককাহিনী, হেঁয়ালি প্রবাদ অথবা অনান্য উপকরণ যেগুলো শব্দের বাঁধনে বিধৃত এবং প্রচলিত। যা হতে পারে ঐতিহ্যগত যন্ত্রপাতি বা হাতিয়ার সমূহ। গঠন-প্রকৃতি, মেজাজ ও চারিত্র্য অনুসারে পণ্ডিতগণ ফোকলোরকে দুইভাগে বিভক্ত করেছেন। যথাঃ

(১) বস্তুকেন্দ্রিক ফোকলোর বা Material Folklore,

(২) সাহিত্য ও শিল্প কেন্দ্রিক ফোকলোর বা Non Material or Fomalised Folklore।

বস্তুকেন্দ্রিক ফোকলোর বা (Material Folklore): গ্রন্থ বা লিখিত কোন সাহায্য ব্যতিরেকে মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি যে সমস্ত বস্তুর সৃষ্টি করেছে সেগুলোই বস্তু কেন্দ্রিক ফোকলোর। যেমন মাছ ধরার চাড়ি বা হাল চাষের জন্য উদ্ভাবিত লাঙ্গল।

সাহিত্য ও শিল্প কেন্দ্রিক ফোকলোর বা Non Material or Fomalised Folklore: যে সমস্ত সৃষ্টি শিল্পগুণান্বিত হয়েছে সেগুলোই সাহিত্য ও শিল্পগুণান্বিত ফোকলোর। যেমন- লোকনাট্য, লোকশিল্প, লোকনৃত্য ও লোকসঙ্গীতসহ প্রভৃতি উপাদান। আমার এই গবেষণার আলোচ্য বিষয় সাহিত্য ও শিল্পকেন্দ্রিক ফোকলোরকে নিয়ে। অপরদিকে ইসলাম (১৯৬৭) ফোকলোরকে নিম্নোক্তভাবেও বিভক্ত করে দেখিয়েছেন। যথাঃ

(১) বাককেন্দ্রিক ফোকলোর, (২) অঙ্গভঙ্গিকেন্দ্রিক ফোকলোর, (৩) আচার-ব্যবহারগত ফোকলোর, (৪) খেলাধুলা কেন্দ্রিক ফোকলোর, (৫) বস্তুকেন্দ্রিক ফোকলোর ও (৬) লিখনকেন্দ্রিক ফোকলোর।

বাককেন্দ্রিক ফোকলোর- এ পর্যায়ের ফোকলোর মানুষের মুখে মুখে সৃষ্টি হয়ে তা মুখে মুখেই বিরাজমান রয়েছে। আমাদের সমাজের বিভিন্ন লোককাহিনী, লোকগীতিকা, লোকসঙ্গীত, ছড়া, প্রবাদ-প্রবচন, লোকবিশ্বাস, লোকবক্তৃতা ও লোকগাথা বাককেন্দ্রিক ফোকলোরের অন্তর্ভুক্ত। পূর্ববর্তী সমাজ থেকে পরবর্তী সমাজে মানুষের মুখে মুখে ভর করে বাককেন্দ্রিক লোকসাহিত্যের জন্ম এবং এক সমাজ থেকে অন্য সমাজ ও এক দেশ থেকে অন্য দেশে প্রসারতা লাভ করে।

অঙ্গভঙ্গি কেন্দ্রিক ফোকলোর — বিশেষ বিশেষ অঙ্গভঙ্গির মাধ্যেমে যেগুলির সৃষ্টি অর্থাৎ লোকভঙ্গি, লোকনৃত্য ও লোকসার্কাসসহ প্রভৃতি। এগুলোর সৃষ্টি মৌখিক ঐতিহ্যের মাধ্যেমে নয়। তবে বংশপরম্পরায় এগুলো যেমন দেখে দেখে অনুকরণের মাধ্যমে প্রচার লাভ করেছে তেমনি কোন কোন সময় মুখে মুখে শুনেও প্রচার লাভ করে থাকতে পারে।

আচার ব্যবহারগত ফোকলোর – বিশেষ বিশেষ আচার ব্যবহার, পূজাপার্বণ বা সংস্কারমূলক কার্যকলাপ থেকে ফোকলোরের অনেক উপাদানের সৃষ্টি হয়েছে। যেমন — লোকাচার, লোকসংস্কার, লোকমেলা, লোকপার্বণ, লোক পূজা- গাছে গাছে বিয়ে দেওয়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আমাদের সমাজে প্রচলিত লোকসংস্কারের একটি বিরাট অংশ লোকবিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত । আর এগুলোকে শুধু মনে প্রাণে বিশ্বাসী করা হয় না, বরং সে অনুযায়ী আচরণও করা হয়। এগুলোকে আমরা আচার-ব্যবহারগত লোকসাহিত্য বলতে পারি। এই জাতীয় ফোকলোর মূলত অনুকরণ পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে বংশ পরম্পরায় প্রচার লাভ করে।

খেলাধূলা কেন্দ্রিক ফোকলোর — সমাজের অশিক্ষিত [যদৃষ্টং] (তার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে অশিক্ষিত শব্দটির সাথে আমি ব্যক্তিগতভাবে মোটেও একমত নই। কারণ আমি মনে করি যে, যাদের তিনি অশিক্ষিত বলে উপস্থাপন করেছেন তারা কোন না কোন শিক্ষায় শিক্ষিত। যেমন- হাল চাষ, বা লোকজ খেলা। এই দুইটি শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি নিরক্ষর হতে পারেন, কিন্তু কোন ভাবেই তিনি বা তারা অশিক্ষিত হতে পারেন না।) সাধারণ মানুষ নিজেদের শরীরচর্চার জন্য এবং সর্বোপরি আনন্দ বিধানের জন্য অনেক খেলাধূলা, ব্যায়াম ও প্রতিযোগিতার উদ্ভাবন করেছে। এগুলোর কিছু সংখ্যক হয়তো অঙ্গভঙ্গি কেন্দ্রিক। তথাপি অঙ্গভঙ্গি ব্যতীত বিশেষ বিশেষ নিয়ম কানুন অনুসরণ করে অনেক খেলার উদ্ভাবন করা হয়েছে যা দেশে বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। এ পর্যায়ের ফোকলোরের মধ্যে হাডুডু, নোন্তা, রসগোল্লা, ডাংগুলি, কানামাছি, ছি বুড়ি ছাইয়া, নৌকা বাইচ, ষাঁড়ের লড়াই ও লাঠিখেলা ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। উপরোক্ত খেলাগুলির মধ্যে দিয়ে মানুষ শুধু অপার আনন্দ লাভ করে শুধু তাই নয়, এর মধ্যে দিয়ে তারা হরেক রকমের লোকসাহিত্য সৃষ্টি করে চলেছে।

বস্তুকেন্দ্রিক ফোকলোর — পুঁথিগত শিক্ষার বাইরে অশিক্ষিত কারিগর যে-সমস্ত বস্তু উদ্ভাবন ও সৃষ্টি করে এবং সেই সৃষ্টি যখন সমগ্র সমাজের ও দেশের হয়ে ওঠে সেগুলোকে বস্তুকেন্দ্রিক ফোকলোর বলা চলে। লোকযান, লোকশকট বা লোকবাহন (Folkcurts) যেমন – গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি ও মহিষের গাড়ি ইত্যাদি।

লিখনকেন্দ্রিক ফোকলোর – ফোকলোরের জন্ম মূলত লিখনগত নয়, মৌখিক ও ঐতিহ্যগত। সভ্যতার অগ্রগতিতে মানব সভ্যতা যখন লিখনপদ্ধতির ও পুঁথিগত শিক্ষার আলোকে প্রবেশ করেছে তখন মৌখিক ঐতিহ্য থেকে অনেক জিনিস লিখিত ঐতিহ্যে প্রবেশ লাভ করে। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের বহু অংশের ভিত্তি মৌখিক ঐতিহ্য। রামায়ন ও মহাভারতের অনেক কাহিনী মৌখিক ঐতিহ্য থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাচীন মৌখিক ঐতিহ্য থেকে যে সমস্ত উপাদান লিখিত সাহিত্যে প্রবেশ করেছিল, সেগুলো পরবর্তীকালে মৌখিক ঐতিহ্যকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। ভারত

উপমহাদেশীয় লোককাহিনীর বিচিত্র গতিপ্রকৃতি বা সামগ্রিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে লিখিত সাহিত্যের নিকট মৌখিক ঐতিহ্যের ধারা অনেক দিক থেকে ঋণী। আমাদের লোকসাহিত্যের উপাদানগুলি শুধু বাক-কেন্দ্রিক নয়, এর কিছু কিছু উপাদান লিখন পদ্ধতি কেন্দ্রিক (পৃ:১১-২৪)।

আমার গবেষণার বিষয় ঘাটু গানকে আমরা মিশ্রপদ্ধতির লোকসাহিত্য হিসেবে উপস্থাপন করতে পারি। ঐতিহ্যবাহী ঘাটু গান একইসাথে মৌখিক ও লিখিত উভয় সাহিত্যের কাছেই ঋণী। ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্য বা দেশজ নাট্যের অন্যতম উপাদান হিসেবে আমরা ঘাটু গানকে চিহ্নিত করতে পারি। দেশজ নাট্য প্রসঙ্গে দীন (১৯৯৬) বলেন,

> বাংলা নাটকের অজস্র আঙ্গিক সহস্র বৎসরের ধারায় বাহিত হয়েছে কিন্তু আদ্যন্ত তার দেহমনে অদ্বৈতের ঝংকার বিদ্যমান। নাটক হয়েও আমাদের নাটক গান থেকে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করেনি, নৃত্যকে করেছে তার ধমনী, কাব্যের গড়নটাকে প্রায় সর্বত্র করেছে আপন অঙ্গাভরণ তার প্রাণের নিখিল লোকায়ত জীবন ও ধর্মকে অবলম্বন পূর্বক আসর থেকে আসরে পরিপুষ্ট হয়েছে। যেখানে কাব্য বা উপাখ্যানটা গেয় সেখানেই বাংলা নাটকের রূপ ও রস স্পর্শ করা গেছে। আমাদের জনপদে নাটক এসেছে কৃত্যের ছদ্মবেশে। শিব, ধর্ম, চণ্ডী, মনসা, গাজী, মানিকপীরের কৃত্যের অবলম্বন যখন আখ্যান তখন তার উপস্থাপনা, আসর ও দর্শক অবলম্বন করেই বিস্তারিত হয়।...আমাদের নাটক পাশ্চাত্যের মতো 'ন্যারেটিভ' ও 'রিচুয়াল' থেকে পৃথকীকৃত সুনির্দিষ্ট চরিত্রাভিনয় রীতির সীমায় আবদ্ধ নয়। তা গান, পাঁচালি, লীলা, গীত, গীতনাট, পালা, পাট, যাত্রা, গম্ভীরা, আলকাপ, ঘাটু, হাস্তর, মঙ্গলনাট, গাজীর গান ইত্যাদি বিষয় ও রীতিকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। বাঙলা নাট্যরীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর আঙ্গিক ও অভিনয়ের বর্ণনাধর্মিতা। (পৃঃ ৩-৪)

আমাদের ঐতিহ্যবাহী ঘাটু গানের সঙ্গে আমরা এর হুবহু মিল দেখতে পাই। আমাদের দেশজ নাট্যের বহুমাত্রিকতা তুলে ধরতে সৈয়দ জামিল আহমেদের 'হাজার বছর বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যকলা' এবং 'Acinpakhi Infinity: Indigenous Theatre of Bangladesh' গ্রন্থের আলোকে মৈশান (২০১২) বলেন,

> একটি লোকনাট্যে'র পরিবেশনার মুখ্য অবলম্বন Performer বা শিল্পী (গায়েন, বায়েন, দোহার) এবং দর্শক ও ত্রিমাত্রিক আয়তন ব্যতীত এর তিনটি মৌল উপাদান রয়েছে- ক. নৃত্য খ. সংগীত (গীত ও বাদন) গ. কথা বা বচন। কথা বা বচন তিন প্রকার : গদ্য, কাব্য ও গীত। কথা'র এই তিন বৈশিষ্ট্য প্রধানত দুই প্রকার অভিনয় ধারায় লক্ষণীয় : বর্ণনাত্মক ও সংলাপাত্মক। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি বর্ণনাত্মক গদ্য, বর্ণনাত্মক কাব্য, বর্ণনাত্মক গীত এবং সংলাপাত্মক গদ্য, সংলাপাত্মক কাব্য, সংলাপাত্মক গীত– এই ছয়টি অভিনয় উপাদান। এছাড়াও

মূকাভিনয়মূলক এবং কথনরীতির আরো দুটি অভিনয় উপাদান রয়েছে। লোকনাট্যের এই আটটি উপাদানের বৈচিত্রময় প্রয়োগের ফলে সাধারণীকরণের মাধ্যমে ৮ প্রকারের নাট্যরীতিকে শনাক্ত করা যায়। যথা: ক. বর্ণনাত্মক রীতি, খ. সংলাপাত্মক রীতি, গ. মিশ্ররীতি, ঘ. নাটগীত রীতি, ঙ. শোভাযাত্রাধর্মী চ অধিব্যক্তিক রীতি, ছ. প্রতিযোগিতামূলক রীতি, জ. কথনরীতি।

কাঠামোগত দিক থেকে প্রত্যেক পরিবেশনাকে ৩ টি পর্বে বিভক্ত করা যায়: ক. বন্দনা তথা আখ্যান- পূর্ব ভাগ খ.আখ্যানভাগ গ. সমাপ্তি পর্ব। চরিত্রের প্রবেশ, প্রস্থানের রয়েছে বিশিষ্ট বিধি ও অতুলনীয় : উদ্ভাবনশক্তি।

লোকনাট্যে'র পরিবেশনায় যেমন রয়েছে বৈচিত্র্যময় আঙ্গিক, তেমনি বর্ণপ্রভাময় এর বিষয়বস্তু। প্রায় ৮০ টি শাখা-প্রশাখার 'লোকনাট্যের' পর্যালোচনার মাধ্যমে জামিল আহমেদ বিষয়ভিত্তিক দিক থেকে বাংলাদেশের 'লোকনাট্য'কে ৮ টি শ্রেণিতে বিন্যাস করেছেন :

ক কৃষ্ণ এবং চৈতন্য বিষয়ক পরিবেশনা;

খ রামচন্দ্রবিষয়ক পরিবেশনা;

গ শিব ও কালীবিষয়ক পরিবেশনা;

ঘ মনসাবিষয়ক পরিবেশনা;

ঙ বৌদ্ধধর্ম ও নাথ বিষয়ক পরিবেশনা;

চ মুসলমান সাধক ও কিংবদন্তী চরিত্র বিষয়ক পরিবেশনা;

ছ ধর্মনিরপেক্ষ পরিবেশনা;

জ সঙ্কর পরিবেশনা। (পৃ:১৯৯-২০০)

উপরে আলোচ্য লোকনাট্যে বহুমাত্রিকতার আলোকে ঘাটু গানের মধ্যে আমরা অনেকগুলো পরিবেশনার উপাদান ও বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। এর আলোকে আমরা একে সঙ্কর পরিবেশনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। ঘাটু গানের প্রধান আকর্ষণ ঘাটু চরিত্র। সুন্দর কিশোর বয়সের ছেলেদেরকে মেয়ে সাজিয়ে ঘাটুতে নাচ-গান পরিবেশন করা হয়। ঘাটু ছোকরাদের অনেক ক্ষেত্রেই লম্বা চুল রাখা বাধ্যতামূলক ছিল। এরা চুলে বেণী ও খোঁপা বাঁধতেন। ঘাটু গানের বিষয়বস্তু হচ্ছে রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়লীলা। চিরায়ত এই প্রেমলীলাকেই কেন্দ্র করে গঠিত হত ঘাটু গানের দল। ঘাটু গান সাধারণত বন্দনা দিয়ে শুরু হয় এবং এর পর পর্যায়ক্রমে উঠে আসে প্রেম তত্ত্ব, মান-অভিমান, বিরহ-বিচ্ছেদ, সন্ন্যাসসহ প্রভৃতি গীত ধারা। এর পাশাপাশি সমাজের সমসাময়িক বিষয়াবলীসহ নানান প্রসঙ্গও এ গানে এসে স্থান দখল করে নেয়। কৃষ্ণের মথুরা

গমণকে কেন্দ্র করে বা তার সান্নিধ্য না পেয়ে রাধা যে বিরহসঙ্গীত পরিবেশন করে তাতে ফুটে ওঠে চিরন্তন বেদনার সুর। আর এই বিরহসঙ্গীতের মধ্যে দিয়েই শ্বাশত বাংলার অপেক্ষমাণ নারীর উপস্থাপন ঘটতো। আমাদের লোকজ গানের প্রাণ পুরুষ উকিল মুন্সি একসময়ে ঘাটু গানের সাথে সরাসরি যুক্ত ছিলেন। আমাদের জাতীয় কবি নজরুলও ঘাটুর মত এক প্রকার জনপ্রিয় লোকজ সংস্কৃতি লেটো গানের দলের সাথে যুক্ত ছিলেন। ঘাটু গানের উচ্চারণ নিয়ে অঞ্চলভেদে ভিন্নতা থাকার দরুণ কোথাও কোথাও শব্দটিকে ঘাঁটু, ঘেটু, ঘেঁটু, গেন্টু, ঘাডু, গাঁডু বা গাঁটু নামে অভিহিত করা হয়। নেত্রকোনা ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ ও সুনামগঞ্জসহ কতিপয় অঞ্চলে এই গান ঘাটু ও গাডু নামেই বেশি প্রচলিত। আর জনপ্রিয় এই গানকে কেন্দ্র করে এক সময় সমাজের মানুষের আভিজাত্য ও প্রতিপত্তি নির্ধারিত হতো। লোকনাট্যের ব্যাপ্তি ও প্রসারতা প্রসঙ্গে আওয়াল (১৯৯৩) বলেন,

> আমাদের লোকনাট্যে যে বিষয়গুলি প্রাধান্য পেয়েছে তার পেছনে লোক সমাজের বাস্তব প্রয়োজন কাজ করেছে। [...] লোকসমাজের বাস্তব জীবনের বিকাশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবেই লোকনাট্য ক্রিয়ার ইতিহাস এগিয়ে গেছে। লোকসমাজের উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎপাদন সম্পর্ক সেখানকার মানুষের জীবনধারা নির্ধারণ করেছে, মানুষের জীবনের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে লোকমনের জগৎ এবং সেই মন নির্মাণ করেছে লোকশিল্পের ভুবন। সেই ভুবনের এক ফসল হচ্ছে লোকনাট্য। (পৃ: ৯৭-৯৮)

গবেষণার প্রেক্ষাপট: ঘাটু গানের কোন প্রতিষ্ঠিত দল না থাকলেও এর সাথে যারা এক সময় জড়িত ছিলেন তাদের অস্থিমজ্জায় মিশে আছে এ গান। যার প্রমাণ আমরা পাই সেই সব শ্রমজীবী মানুষের মাঝে যারা এক সময় বাধ্য হয়েছেন এ পেশা ত্যাগ করে অন্য পেশা গ্রহণ করতে৷ কোন সামাজিক প্রেক্ষাপটের কারণে এরা ঘাটু গানের দলে কাজ না করে ভিন্ন পেশায় যেতে বাধ্য হয়েছে তা আমরা খুঁজে দেখতে পারি৷ এর মাধ্যমে আমরা জানতে পারব যে কি কারণে সমাজ থেকে জনপ্রিয় কোন বিনোদন ধারা লুপ্ত হয়ে যায়৷ অর্থাৎ কি বৈশিষ্ট্যর কারণে সমাজের সাধারণ আমজনতা এই জনপ্রিয় ধারার বিপক্ষে গিয়ে এটাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন সে সম্পর্কেও ধারণা পেতে পারি । এর মধ্যে দিয়ে আমরা দেখতে পারি যে সামাজিক বিনোদন মাধ্যমের সাথে সমাজের জনগণ, কোন সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে একে গ্রহণ বা বর্জন করে বা সামাজিক প্রথা ও কাঠামো কিভাবে একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত । আমাদের দেশে কালীকাছ, সংযাত্রাসহ অন্যান্য পারফরমেঞ্চে নারীচরিত্র পুরুষেরা উপস্থাপন করে থাকেন। কিন্তু কালীকাছ ও সংযাত্রায় নারী চরিত্রে পুরুষের অভিনয় আর ঘাটু গানে নারী চরিত্রে পুরুষের অভিনয় সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়৷ অনেক আলোচকের আলোচনা থেকে জানা যায় ঘাটু গানের দলের ঘাটুপুত্রের সঙ্গে নিজ দলের সরকার ও সমোজদারের যৌন সম্পর্ক থাকতো। কিন্তু কালীকাছ ও সংযাত্রার অভিনয়ের সাথে যৌনতার কোন সম্পর্ক নেই। তাই সমাজে ঘাটু গান এবং সংযাত্রা ও কালী কাছের আপেক্ষিকতা ও গ্রহণযোগ্যতা আলাদা। ঘাটু গানের সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছে গ্রামবাংলার সাধারণ জনতা৷ তারা জীবিকার তাগিদে নিজেদের বেঁচে থাকার স্বার্থে এ গানের সাথে সম্পৃক্ত থাকতো। তাই এর সাথে জড়িয়ে আছে আমাদের সমাজের এক শ্রেণীর মানুষের জীবনসংগ্রামের করুণ ইতিহাস এবং মানুষের জীবনধারণের পদ্ধতি ও সামাজিক, অর্থনৈতিক অবকাঠামো । কিন্তু সমাজের এই শ্রেণীর মানুষের জীবনধারণ ও তাদের পেশা নিয়ে অর্থাৎ ঘাটু গানের সাথে সম্পৃক্ত মানুষদের নিয়ে কাজ হয়নি বললেই চলে। তাই আমি মনে করি যে উক্ত কারণের আলোকে *ঘাটু গানের সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট* নিয়ে কাজ করাটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

পুস্তক পর্যালোচনা: আহমেদ (২০০০) ও রাজী (২০১০) ঘাটু গানের প্রচলিত অঞ্চল, ঘাটু গান পরিবেশনের সময়, পৃষ্ঠপোষকতা, দলের গঠন কাঠামো, দল ও অভিনেতাদের পরিচিতি, অভিনয় কাঠামো, সাজসজ্জা ও পোশাক-পরিচ্ছদ, অভিনীত বিষয়বস্তু, অভিনয় রীতি, লাডাক, বট ঘাটু, সমকামিতা, প্রাত্যহিক কাজে এ গানের ব্যবহার, গানে ব্যবহৃত নাচের ধরন, গানের নমুনা, সংলাপ প্রক্ষেপণের ধরনসহ ইত্যাদি প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন।

আহমদ (২০১৪) ঘাটু গানের উদ্ভব কাল ও স্থান, প্রকারভেদ এবং পরিবেশনা রীতি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

কাসিমপুরী ৫(২) ও আলী ১১(২) ঘাটু শব্দের উৎপত্তি,বিষয়বস্তু, আঞ্চলিক বিরহ প্রধান নৃত্যগীত, বাদ্য যন্ত্রের ব্যবহার, বট ঘাটু, গানের নমুনা,ঘাটু গানের বৈশিষ্ট্য, ছবকি গান (ঘাটুর অনুরূপ ছেলেরা মেয়ে চরিত্রে অভিনয় করে থাকে), ছবকি ও ঘাটুতে বাদ্য যন্ত্রের ব্যবহার ও লয় নিয়ে আলোচনা করেছেন।

মিঞা (২০০১) ও ব্রহ্ম (১৯৮৯) ঘাটু গানের প্রচলিত অঞ্চল, বিষয়বস্তু, উদ্ভবের প্রেক্ষাপট ও ঘাটুতে ব্যবহৃত নমুনা গান, ঘাটু নাচ, ঘাটু গানের অংশ বিভাজন, পোশাক পরিচ্ছেদ ও পরিবেশন কাল নিয়ে আলচনা করেছেন।

ব্রহ্ম (১৯৮৯) হরি বিদ্বেষী দেবতা ঘেটুকে কেন্দ্র করে উৎসব ও লৌকিক উপাসনামুলক গান নিয়ে আলোচনা করেন।

খান (২০১৩) ও সরকার (২০১২) ঘাটু গানের বিষয়বস্তু, পরিবেশনকাল, ঘাটুর ওস্তাদ ও পাইল, বাদ্যযন্ত্র, বাহার, পোশাক পরিচ্ছেদ, মঞ্চ, পরিবেশন রীতি বিভিন্ন ধরনের গানের নমুনা, বন্দনা, ঘাটু গানের পংক্তি সংখ্যা, ঘাটু গানের শিল্পীবৃন্দ, দর্শক শ্রেণী, ঘাটু গানের প্রচলিত অঞ্চল, ঘাটু শব্দের উৎপত্তি, পৃষ্ঠপোষকতা, ঘাটু গানের ধারা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেন।

রহমান এবং আহমেদ (২০০৫), হুদা (২০০৭ ক, ২০০৭ খ, ২০০৭ গ, ২০০৭ ঘ) ও ইসলাম (২০০৩) ঘাটু গানের বিষয়বস্তু, নানা শ্রেণীর ঘাটু গান, ঘাটুর সাথে তামাশা যাত্রা সঙ ও গীতিকার তুলনা, ঘাটু গানের নমুনা, ঘাটু গানের ধারা, ঘাটু নাচ, ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন।

আহমেদ (২০০৭) ঘাটু গানের বিষয়বস্তু ও মঞ্চস্থ স্থান, নাচ, ঘাটু গানের প্রচলিত অঞ্চল, সমকামিতা, অঞ্চল ভেদে উপস্থাপনগত পার্থক্য, সাজসজ্জা, পরিবেশনা পদ্ধতি, যন্ত্রাদির ব্যবহার, ব্যবহৃত গানের নমুনা ইত্যাদি নিয়ে কথা বলেছেন।

কবির (২০০৯) ও দুলাল (২০০৭), তালুকদার (২০০৭), রহমান (২০০৭), খান (২০০৭) ঘাটু গানের জন্ম, ঘাটুর শিল্পী, বিষয়বস্তু, ঘাটু ও অন্যান্য গীত ধারা, গানের সুর ও বিভিন্ন পর্বের গানের নমুনা, ঘাটু গানের উৎপত্তি, বাদ্য যন্ত্র, সরকার ও কর্মী হিসেবে সমকামী যুবক এবং প্রচলিত অঞ্চল নিয়ে আলোচনা করেছেন।

খাতুন (২০০৩) ও আহমদ (২০০৩) নামকরণ, বিষয়বস্তু, এ গানের উৎপত্তি, ঘাটুর রূপ ও পোশাক পরিচ্ছদের বর্ণনা, পরিবেশনার সময়কাল, সরকার, বাদ্যযন্ত্র, পৃষ্ঠপোষকতা, প্রচলিত অঞ্চল, ঘাটু নাচ, ঘাটু নাচের বিষয়বস্তু, নাচের সাথে ব্যবহৃত গানের ধরণ এবং এ গানের উপর কিশোরীভজন গানের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছেন।

দীন (১৯৯) ঘাটু কে দ্বি চরিত্র বিশিষ্ট ঢপ শ্রেণীর আদিরসাত্মক নাট্যাভিনয় হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এর পাশাপাশি তিনি ঘাটু গানের গায়েন, দোহারদের অভিনয়ের সময় বসার অবস্থান নিয়ে আলোচনা করেছেন।

আহমেদ (১৯৬৯) ঘাটুকে অবসর বিনোদনের নাচ, ঘাটুর বিষয়বস্তু, ঘাটু গানের পৃষ্ঠপোষকতা, ভিত্তিমূলের ঐতিহ্য নিয়ে আলোচনা করেছেন।

আহমেদ (২০০৭ ক, ও ২০০৭ খ) ঘাটু নাচ ও আধ্যাত্মিকতা, ঘাটু দলের গঠন, ঘাটুর ব্যবহৃত পোশাক পরিচ্ছদ, বাদ্যযন্ত্র, মাসোয়ারা, পৃষ্ঠপোষকতা, ঘাটু দলের অভিনেতা ও দর্শকদের সম্প্রদায় ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

উদ্দিন (১৯৯৯) ঘাটু গানের বিষয়বস্তু, প্রচলিত অঞ্চল, কুশীলবের পরিচয়, সাজসজ্জা, ঘাটু কেনাবেচা, সমাজে ঘাটুর অবস্থান, ঘাটুকে নিয়ে মানুষের কৌতূহল ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

পিটকো (২০১২) ক্লাসিক্যাল কথাকলি নাটকে নারী চরিত্রের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা তুলে ধরেন। কৃষ্ণ কর্তৃক পুতনা বধের মধ্যে দিয়ে তিনি ক্লাসিক্যাল নাটকে নারীর রূপ তুলে ধরেন। এ আলোচনায় ঘাটু গান সম্পর্কিত লেখা না থাকলেও এ থেকে আমরা সমাজে নারীকে প্রতিরূপায়ণের প্রক্রিয়া দেখতে পাই। যা আমার গবেষণার জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

তিয়ান (২০১২) ঐতিহ্যবাহী চাইনিজ নাটকে আন্নাগাটা (চাইনিজ মেইল ডান), তাদের পরিধেয় বস্ত্র (যা বিশেষ শ্রেণীর মানুষের মাঝে যৌন আবেদন ও আনন্দ তৈরি করে), আন্নাগাটার অভিনয় পদ্ধতি, আন্নাগাটার আদিরূপ ও বিভিন্ন বংশের শাসনামালে এর অবস্থান, বিখ্যাত অভিনেতা মেই ল্যাং ফাং এর অভিনয়, বিভিন্ন বংশের শাসনামালের সময় পুরুষের দ্বারা নারী চরিত্র রূপদানের ক্ষেত্রে পণ্ডিতদের অভিমত, স্বেচ্ছাচারী মহিলা ও কোমলমতি মহিলাদের চরিত্র রূপদানের কৌশল, ছেলেদের মেয়ে সাজার কারণ, সেক্সের ব্যক্তিক প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন। যা আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভের সাথে অত্যন্ত সঙ্গতিপূর্ণ।

অল্ট (২০১২) খেয়ালে নারী চরিত্রের উপস্থাপন, তাদের পরিধেয় বস্ত্রাদি, খেয়ালে পালনীয় কৃত্য, স্টেজ প্রপারটিজ, মেকাপসহ ইত্যাদি বিষয়াবলী নিয়ে আলোচনা করেছেন। এখানে নারী চরিত্র পুরুষের দ্বারা অভিনীত হয়। তাই এটাও আমার বিষয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

ডায়মন্ড (২০১২) কোমল চরিত্রে নারী এবং রাফ চরিত্রে পুরুষকে উপস্থাপন, পুরুষের সাথে নারীর অবস্থান তুলে ধরা হয় নারীকে পিতৃতন্ত্রের আলোকে পুরুষের অবস্থানে স্থানান্তরিত করে তা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

তং (১৯৯৮) নারীবাদী চিন্তার বহুমুখিতা আলোচনা প্রসঙ্গে উদার নারীবাদীতত্ত্ব, মৌলিক কাঠামোগত নারীবাদীতত্ত্ব, মনঃসমীক্ষণ ও লিঙ্গ ভিত্তিক নারীবাদীতত্ত্ব, অস্তিত্ববাদী নারীবাদীতত্ত্ব, পোস্ট মডার্ন ফেমিনিজম, বহুত্ব সংস্কৃতি ও সর্বব্যাপী নারীবাদীতত্ত্ব এবং ইকোফেমিনিজম এর সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

রিটজার (১৯৯২) সমাজবিদ্যা বিষয়ক বিভিন্ন তত্ত্বের আলোকে নিউ মার্ক্সিজমের বিভিন্ন তত্ত্ব, ফিনোমেনোলজিকাল সোশিয়লজি ও ইথনোমেথডলজি, কনটেম্পরারি ফেমিনিস্ট থিউরি, মাইক্রো ও ম্যাক্রো ইন্টিগ্রেশন ও সিন্থেসিস থিউরিসহ বিবিধ বিষয়াবলী নিয়ে আলোচনা করেছেন।

থোয়ক এবং রস (২০১২) ঐতিহ্যবাহী পোশাক ও মুখোশের ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে জেন্ডারের উপস্থাপন, দিদিকের সাক্ষাৎকারের মধ্যে দিয়ে তার অভিনয় জীবন এবং তার জীবনের শিক্ষার মধ্যে দিয়ে আমরাও যে জীবনে শিক্ষা নিতে পারি তা অত্যন্ত কৌশলে তুলে ধরেছেন।

মিঞা (২০০১) প্রেম নির্ভর বিষয়বস্তু, উৎপত্তিস্থল হিসেবে আসামের নাম, ময়মিনসিংহের সাথে আসামের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ, বিচ্ছেদ ও নৈরাশ্যবাদী বৈশিষ্ট্য, বালিকা রূপে বালকের সাজ, ও সংগৃহীত গানের নমুনা উল্লেখ করেন।

উপরের বিবরণ থেকে আমরা দেখতে পাই যে, অনেক গবেষক ঘাটু গানের বিষয়বস্তু, প্রচলিত অঞ্চল ও উৎপত্তি, পৃষ্ঠপোষকতা, সাজসজ্জা, সমকামিতা, বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার, নমুনা গান ও অন্য উপাদানের সাথে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। উল্লেখিত ব্যক্তিবৃন্দ ঘাটু গানে ব্যবহৃত নাচ, বাদ্যযন্ত্র, পাইল-দোহার, বিষয়বস্তু, পরিবেশনাকাল ও স্থানসহ বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করলেও কেউই এ গানের সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট ও অভিনয় কৌশল নিয়ে কাজ করেননি এবং এ পর্যন্ত কোন লেখাতেই ঘাটু গানের অভিনয় কৌশল নিয়ে আলোচনাও দেখতে পাইনি। আর যে কোন গবেষণা সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনার জন্য কিছু উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে সুচিন্তিত মতামত তুলে ধরা প্রয়োজন। আমি এই গবেষণার মাধ্যমে ঘাটু গানের শিল্পীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য অবস্থার মূল্যায়ণ করতে চাই। বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় ধারা হিসেবে এর বিভিন্ন প্রসঙ্গ ও প্রকরণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমাদের সংস্কৃতির বাহক হিসেবে বর্তমান সমাজে এর অবস্থান নির্ণয় এবং নারী চরিত্র রূপদানের ক্ষেত্রে তাদের আশ্রিত কৌশল খুজে বের করার মধ্যে দিয়ে *ঘাটু গানের সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট* তুলে ধরাই আমার এই গবেষণার মূল

উদ্দেশ্য। তাই উপরোক্ত আলোচনার সাপেক্ষে আমি মনে করি যে *ঘাটু গানের সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট* নিয়ে কাজ করাটা অত্যন্ত জরুরি।

গবেষণার যৌক্তিকতা: গ্রামের নওজোয়ান, হিন্দু- মুসলমান, মিলিয়া বাউলা গান আর ঘাটু গান গাইতাম, আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম আমরা। আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম…

বাউল আব্দুল করিম রচিত উপরোক্ত গানে ঘাটু গানের স্থলে এখন গাওয়া হয় মুর্শিদী গাইতাম। কিন্তু ইতিহাসের পাঠ ও বিভিন্ন গবেষকসহ অনেক বরেণ্য ব্যক্তিদের গবেষণার মধ্যে থেকে আমরা জানতে পারি যে এক সময়ে বাংলার গ্রামীণ জনপদে ঘাটু গান তার পোক্ত আসন দখল করেছিল। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় এ গান বিলুপ্ত হয়ে ধ্বংসের সর্বশেষ দ্বারপ্রান্তে। বিলুপ্তপ্রায় লোক সঙ্গীতের এই প্রকরণটির মধ্যে দিয়েই তৎকালীন সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের জীবনযাত্রা, আর্থসামাজিক অবস্থান, সামাজিক প্রতিপত্তি ও আধিপত্য প্রকাশ পেত। ঘাটু গানের অন্যতম প্রধান চরিত্র হচ্ছে ঘাটু। দেখতে সুন্দর, নাচ গানে পারদর্শী ও অনেকটা মেয়েলি স্বভাবের অধিকারী সমাজের কিশোরেরাই এ চরিত্র রূপদান করতো। যাঁরা ঘাটু পালতেন তাঁদেরকে মানুষ সমাজের অন্যান্য মানুষের থেকে উচ্চ পর্যায়ের বলে অভিহিত করতেন। ঘাটুকে সবাই খুব সমীহ করতেন আবার ক্ষেত্র বিশেষে সমাজের অনেক মানুষের গঞ্জনার শিকারও হতে হত। অনেক অনেক ঘাটু ছিল তাদের গ্রামের অন্য সব মানুষের জন্য সম্মান ও গৌরবের পাত্র। ঘাটুর উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য অনেক সময় এক গ্রামের সঙ্গে অন্য গ্রামের মানুষেরা মারামারিতে লিপ্ত হতেন। এমনকি ঘাটুকে নিয়ে খুনাখুনি পর্যন্তও হয়ে যেত। কালের বিবর্তনে এ পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ বাধ্য হয়ে অন্য পেশা গ্রহণ করেছেন। এমনকি এদের মধ্যে অনেকেই কোন এক সময়ে যে এ গানের সাথে যুক্ত ছিলেন সে কথা পর্যন্ত স্বীকার করতে চান না। এর পিছনের অন্যতম কারণ হচ্ছে আমাদের বর্তমান কালের সমাজ ব্যবস্থা। বর্তমান সমাজের প্রেক্ষাপটে আমরা ঘাটু গানের স্থলে অন্য গানকে স্থাপন করি। সংযাত্রা, কালিকাছসহ অনান্য লোকনাটকে নারী চরিত্র উপস্থাপনে পুরুষের অংশগ্রহণ মেনে নিলেও সমাজ কি কারণে ঘাটু গানে তা মেনে নিচ্ছেন না তা আমাদের জানার জন্য অতীব জরুরি। এমন একটি লোকজ বিনোদন ধারা যার জন্য তৎকালীন সমাজের মানুষেরা নিজেদের মধ্যে মারামারি থেকে শুরু করে খুনখুনিতে লিপ্ত হত, কিন্তু একে নিয়ে এ পর্যন্ত তেমন কোন গবেষকই কাজ করেননি। তাই আমি মনে করি যে, *ঘাটু গানের সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট* শিরোনামে গবেষণাটি করা একইসাথে গুরুত্বপূর্ণ এবং যৌক্তিক।

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: প্রত্যেক গবেষণারই কিছু উদ্দেশ্য থাকে, যার কারণে গবেষণা কর্মটি পরিচালিত হয়। যে কোন গবেষণা সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনার জন্য কিছু উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে সুচিন্তিত মতামত তুলে ধরা প্রয়োজন। আমি এই গবেষণার মাধ্যমে ঘাটু গানের শিল্পীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য অবস্থার মূল্যায়ন করতে চাই। বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় ধারা হিসেবে এর বিভিন্ন প্রসঙ্গ ও প্রকরণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমাদের সংস্কৃতির বাহক হিসেবে বর্তমান সমাজে এর অবস্থান, নারী চরিত্র রূপদানের ক্ষেত্রে তাদের আশ্রিত কৌশল খুজে বের করার মধ্যে দিয়ে সর্বোপরি এর সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট নির্ণয় করাই আমার এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য।

গবেষণার রীতি ও পদ্ধতি: লৌকিক উপাদানের বহুমুখী প্রবণতার জন্য এর গবেষণার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন মতবাদ (School), পদ্ধতি (Method), তত্ত্ব (Theory) গড়ে উঠেছে। ফোকলোর চর্চার পদ্ধতি সম্পর্কে আহমেদ (২০০৭) বলেন,

লোককলা চর্চার কতক প্রধান স্বীকৃত পদ্ধতি আছে, যথা:

নন্দনতাত্ত্বিক পদ্ধতি (Aesthetical Method)

নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতি (Antropological Method)

সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতি (Sociological Method)

মনোসমীক্ষণ পদ্ধতি (Psycho-Analytical Method or Theory of Psycho-Analysis)

ভাষাতাত্ত্বিক পদ্ধতি (Philological Method)

তুলনামূলক পদ্ধতি (Comparative Method) ইত্যাদি। ...গ্রিম ভাতৃদ্বয়, কার্ল ক্রোন, এ্যানটি আর্নে, থিওডোর বেনফে, ক্লদ লেভি-স্ট্রস, ভ্লাদিমির প্রপ, স্টিথ থম্পসন, এক্সেল ওলরিক, এ্যালান ডান্ডিস, বেন ডান- আমোস প্রমুখের নাম করতে হয়। তাঁরা যেসব তত্ত্ব দেন, সেসবের মধ্যে প্রধান কয়েকটি তত্ত্ব নিম্নরূপ :

ভারতীয় তত্ত্ব (Indionis Theory) বা এককেন্দ্রিক উদ্ভবতত্ত্ব (Theory of Monogenesis)

সমান্তরালবাদ (Parallelism) বা বহুমুখী উদ্ভবতত্ত্ব (Theory of Polygenesis)

বিকিরণবাদ বা সম্প্রসারণবাদ (Diffusionism)

ঐতিহাসিক- ভৌগলিক পদ্ধতি (Historical-Geographical Method)

ধ্রুবসূত্র (Epic Laws)

তুলনামূলক পদ্ধতি (Comparative Method)

প্রতীকবাদ (Theory of Symbolism)

রূপতাত্ত্বিক পদ্ধতি (Structuralism)

চিহ্নবিজ্ঞান (Semiotics)

লোককলাভিত্তিক মতবাদ ও তত্ত্বগুলো মূলত লোককাহিনীর গবেষণাকেই কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। (পৃ: ২০-২১)।

ঘাটু গান বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মিশ্র পদ্ধতির অবলম্বন করা হয়েছে। আলোচনা করতে গিয়ে দেখা যায় যে, উপরে উল্লেখিত বিভিন্ন মতবাদ ও পদ্ধতির সংমিশ্রণে লোকজ সংস্কৃতির অন্যতম উপাদান ঘাটু গানকে বিশ্লেষণ করা যায়। তাই উপর্যুক্ত

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে এ গবেষণাকর্মটি পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহের সময় বৈজ্ঞানিক, যুক্তিপূর্ণ ও বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। গবেষণাটি পরিচালনার ক্ষেত্রে বিকিরণবাদ (Diffusionism), ঐতিহাসিক-ভৌগলিক পদ্ধতি (Historical-Geographical Method), পরিবেশনা পদ্ধতি (Performance Theory), পরা-লোককলা তত্ত্ব (Metafolklore Theory), তুলনামূলক পদ্ধতি (Comparative Method) এবং নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতি (Anthopological Method) এর আলোকে তত্ত্ব ও উপাত্তগুলোকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। বিকিরণবাদ (Diffusionism) প্রসঙ্গে অগ্রজ লেখক ও গবেষকদের তত্ত্ব ও গবেষণার আলোকে আহমদ (২০০৭) বলেন,

> সাধারণত সংস্কৃতির উদ্ভব, বিকাশ ও প্রাসারের সাথে এই মতবাদটি যুক্ত। আলোর উৎস এক, কিন্তু তার কিরণ বা রশ্মি চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত হয়। মানব সংস্কৃতি কোন এক ভূমি থেকে উদ্ভূত হয়; পার্শ্ববর্তী জনজাতির সাথে লেনদেনের মাধ্যমে সে সংস্কৃতির বিস্তার ঘটে। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ভ্রমণ করার সময় মূল সংস্কৃতি অক্ষত থাকে না; আঞ্চলিকতার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিবর্তিত হয়। লোককলা তত্ত্বের পরিভাষায় একে 'বিকিরণবাদ' 'সম্প্রসারণবাদ' বা 'সংমিস্রণতত্ত্ব' (Diffusion)বলে। প্রধানত স্বাক্ষরহীন জনজাতির অনুকরণ-প্রবণতা থেকে বিকিরণবাদের উদ্ভব হয়। এই তত্ত্বের আলোকে লোককলার উপাদানসমূহ কেন্দ্র থেকে উৎসারিত হয়ে ত্রিবিধ উপায়ে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রসারিত হয় : ১. স্থানিক প্রসারণ (Spatial diffusion), ২. স্পর্শক প্রসারণ (Diffusion by contact) এবং ৩. উদ্দীপক প্রসারণ (Stimulous diffusion)।
>
> মাত্রাগত বিচারে আমরা প্রথম স্তরকে প্রবর্তনা (Innovation), দ্বিতীয় স্তরকে অনুকরণ (Imitation), আর তৃতীয় স্তর প্রবর্তনা (Persuation) প্রক্রিয়ায় এই সম্প্রসারণ ঘটে থাকে। বাউল গানের উদ্ভব কেন্দ্র কুষ্টিয়া। এ ধারার গানের প্রবর্তক লালন শাহ; লালন ও তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্য দ্বারা তা সমৃদ্ধ হয়ে কেন্দ্র ভূমিতে প্রসার লাভ করে। এটি 'স্থানিক পদ্ধতি'। এরপর পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোতে বাউল গান সম্প্রসারিত হয় সরাসরি 'স্পর্শক পদ্ধতি'তে। যশোর ও নদীয়া প্রভৃতি জেলার বাউলগণ অনুপ্রাণিত হয়েছেন। ঢাকা, সিলেট, বীরভূম ও বর্ধমানে বাউল গানের উদ্ভব 'উদ্দীপনা পদ্ধতি'তে (পৃ:২৭-২৮)।

এর আলোকে আমরা যদি ঘাটু গানের উৎপত্তি হিসেবে বৃহত্তর সিলেটের হাওর অঞ্চলকে ধরে নিই তাহলে দেখতে পাই যে, তা উপরে উক্ত বাউল গানের মত একই প্রক্রিয়া অবলম্বন করে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতে প্রসার লাভ করেছে৷ অপরদিকে ঐতিহাসিক-ভৌগলিক পদ্ধতি (Historical-Geographical Method) এর মধ্যে দিয়ে আমরা ভৌগলিক উপাদান বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে এর উৎস ভূমির সন্ধান এবং ভাষাগত বৈশিষ্ট্যকে বিবেচনায় নিতে পারি। ঘাটু গান বিষয়ক

তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে পরা-লোককলা তত্ত্বের (Metafolklore Theory) আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে। পরা-লোককলা তত্ত্বের (Metafolklore Theory) প্রসঙ্গে আহমদ (২০০৭) বলেন,

> পরা-লোককলা তত্ত্বের মদ্দা কথা হলো, 'লোকে'র (Folk) চোখ দিয়ে লোককলাকে দেখা বা মূল্যায়ন করা। অর্থাৎ যারা লোককলা সৃষ্টি ও চর্চা করে, লোককথা সম্পর্কে তাদের বক্তব্য কি, তা বিচার-বিবেচনায় এনে তার সামগ্রিক মূল্যায়ন করাই এই তত্ত্বের মূল কথা। এক্ষেত্রে ক্ষেত্র-সমীক্ষার (Field study) ওপর জোর পড়ে। এ ব্যাপারে কাল-উইলহেলম ভন সিডো কথিত 'সক্রিয় ঐতিহ্য-বাহক' (Active tradition bearer) ও 'নিষ্ক্রিয় ঐতিহ্য-বাহক' (Passive tradition bearer) নাম-শব্দ দুটির কথা মনে রাখা দরকার। যারা লোককলা সৃষ্টি ও চর্চায় সরাসরি জড়িত তারা 'সক্রিয় ঐতিহ্য-বাহক', যেমন কথক, বয়াতি, কবিয়াল, গায়েন, দোহার, সূত্রধর, ছোকরা, ঘাটু ও ঘাটু সরকার ইত্যাদি। আর যারা লোককলার কোনো বিষয় দেখে ও শুনে শিখে এবং কদাচিৎ চর্চা করে তারা 'নিষ্ক্রিয় ঐতিহ্য-বাহক'। প্রথমোক্ত শ্রেণী লৌকিক উপাদানের অর্থ (meaning) ও প্রসঙ্গ (context) সম্পর্কে যতখানি সঠিক তথ্য দিবেন, দ্বিতীয় শ্রেণী ততখানি তথ্য দিতে সক্ষম নন। সুতরাং মূল পাঠ (text) এবং পাঠ-সংক্রান্ত তথ্য (context) সংগ্রহে লোককলাবিদের সতর্ক দৃষ্টি রাখা অপরিহার্য। মূল পাঠ ও পাঠ সংক্রান্ত তথ্যকে একত্রে পরা-লোককলা বলা হয় (পৃ:৪১)।

ঘাটু গানের সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট শিরোনামে গবেষণার আলোকে পরা-লোককলা তত্ত্বের আশ্রয় নেওয়া হয়। এর পাশাপাশি পরিবেশনা পদ্ধতিকেও সমধিক গুরুত্বারোপ করা হয়। ডান বেন-আমোস পরিবেশনা পদ্ধতির প্রবক্তা। পরিবেশনা পদ্ধতি প্রসঙ্গে আহমদ (২০০৭) বলেন,

> কি পদ্ধতিতে লোককলার উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, তাৎপর্য উপলব্ধি করা সম্ভব হবে- এরূপ ধারণা থেকে পণ্ডিতগণ Performance Theory-র কথা বলেন। আমরা এর প্রতিশব্দ হিসেবে 'পরিবেশনা পদ্ধতি' নির্বাচন করেছি। পরিবেশ-পরিস্থিতিসহ মূলপাঠের সার্বিক গবেষণার (Contextual Research) রীতি পদ্ধতি এর মুখ্য বিষয়। ...পরিবেশনা পদ্ধতিতে তিনটি বিষয় গুরুত্ব পায় :
>
> ১. মূল উপকরণ (Text);
>
> ২. গায়ক-কথক তথ্যদাতা (Informant);
>
> ৩. পরিবেশ-পরিস্থিতি (Context)

এই পদ্ধতির গবেষণায় 'লোক' (Folk) ও 'কলা' (lore) উভয়ই সমান গুরুত্ব পায়। আর এখানেই এই পদ্ধতির গবেষণার স্বাতন্ত্র্য ও অভিনবত্ব নিহিত আছে। (পৃ:৪৫)

উক্ত গবেষণায় পরিবেশনা পদ্ধতির মত করে তুলনামূলক পদ্ধতিরও আশ্রয় নেওয়া হয়। এ পর্যায়ে ঘাটু গানের সাথে দেশীয় সাংস্কৃতিক উপাদান সংযাত্রা, কালিকাছ ও মহিষাসুরবধ এর পাশাপাশি বিদেশী সাংস্কতিক উপাদান আফগানিস্তানের বাচ্চাবাজি, চাইনিজ মেইল ডান, জাপানি আন্নগাতা ও ভারতীয় খেয়ালের সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়। তুলনামূলক পদ্ধতির পাশাপাশি নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতির (Anthopological Method) আলোকেও সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের মধ্যে দিয়ে ঘাটু গানকে বিচার বিশ্লেষণ করা হয়। নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতির (Anthopological Method) প্রসঙ্গে আহমদ (২০০৭) বলেন,

> নৃতত্ত্বের দুটি প্রধান শাখা — শারীরিক নৃতত্ত্ব (Physical Anthropology) ও সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব (Cultural Anthropology) । বলাবাহুল্য, সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের সাথেই লোককলার যোগসূত্র বেশি । নৃতত্ত্ববিদেরা লোককলাকে সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের অঙ্গ বলেই গণ্য করেন। ...নৃবিজ্ঞানীরা উপাত্ত সংগ্রহ ও চিহ্নিত করেই ক্ষান্ত হন না, আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে এর সঠিক অবস্থান, কার্যকারিতা এবং পুরো পদ্ধতির (System) সাথে সম্পর্কের কথা বিশ্লেষণ করেন । এর জন্য তিনি প্রয়োজনীয় তত্ত্বের আশ্রয় নিতে পারেন- হতে পারে তা বিবর্তনবাদ (Theory of Survival), সম্প্রসারণবাদ (Diffusionism), প্রতীকবাদ (Symbolism), কার্যবাদ (Functionalism) বা সংগঠনবাদ (Structuralism)। (পৃ:৪৭-৪৮)

আর এরই ধারাবাহিকতায়, ঘাটু গান সংক্রান্ত প্রতিটি নিদর্শন ও তথ্যকে কৌতুহলী এবং অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে পূর্বসূরী গবেষকদের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সিদ্ধান্ত নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়েছে। যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে গবেষণার বিষয় সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য পর্যাপ্ত পরিমাণে না পাওয়ায় প্রাথমিক পর্যায়ের উৎসের (Primary source) প্রতি অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণা কর্মের প্রয়োজনে ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা ও সিলেট অঞ্চলের বিভিন্ন উপজেলায় সরেজমিনে নমুনায়নের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে ঘাটু গানের সাথে সম্পৃক্ত লোকজন ও তাদের নিকটাত্মীয়দের এবং সেই সাথে উক্ত অঞ্চলের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সংস্কৃতিমনা ব্যক্তিদের কাছ থেকে প্রাথমিক উপাত্ত হিসেবে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভটির অনেক অনেক তথ্য ব্যবহৃত উৎস (Secondary Source)- যেমন: বই, পত্রিকা ও বিভিন্ন ধরনের জার্নাল থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমির গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগার,

জাতীয় গ্রন্থাগার ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বাংলা বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি, সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি, নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগের নিলুফার ইয়াসমিন সেমিনার লাইব্রেরি এর বিভিন্ন ধরনের সংকলন ও জার্নালসহ বিভিন্ন জাতীয় সংবাদপত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। অপরদিকে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান প্রধান এবং অভিসন্দর্ভটির তত্বাবধায়কের পরামর্শক্রমে আলোচনার মধ্যে দিয়ে নিজস্ব মতামত প্রদানের চেষ্টা করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভটির তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে যেসকল উৎস সমূহ ব্যবহার করা হয়েছে তা একটি টেবিলের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল।

প্রাথমিক পর্যায়ের উৎস (Primary Source)	দ্বিতীয় পর্যায়ের উৎস (Secondary Source)
সাক্ষাৎকার: বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ,গবেষক ও সমাজের নানা শ্রেণী পেশার মানুষ।	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমির গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগার, জাতীয় গ্রন্থাগার ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বাংলা বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি, সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের সেমিনার লাই লাইব্রেরি, নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগের নিলুফার ইয়াসমিন সেমিনার লাইব্রেরি, এর বিভিন্ন ধরনের সংকলন ও জার্নালসহ বিভিন্ন জাতীয় সংবাদপত্র।

এই গবেষণার ক্ষেত্রে মিশ্র পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। ঘাটু গান সম্পর্কে বাংলাদেশে বর্তমানে পূর্ণাঙ্গ তথ্য পাওয়া খুবই কঠিন। এ বিষয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ের তথ্যের অপ্রতুলতা মূলত প্রথম পর্যায়ের উৎস থেকে পূরণ করতে হয়েছে।

গবেষণাটিকে পর্যায়ক্রমে আলোচনা ও বিশ্লেষণের সুবিধার্থে নিম্নোক্ত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যা টেবিলের মাধ্যেমে তুলে ধরা হল:

অধ্যায় ও অধ্যায়ের নাম	অধ্যায়ের পরিধি বা আলোচ্য বিষয়
	গবেষণার প্রেক্ষাপট পুস্তক পর্যালোচনা

ভূমিকা	গবেষণার যৌক্তিকতা গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য গবেষণার রীতি ও পদ্ধতি সুপারিশমালা
প্রথম অধ্যায়: গবেষণা অঞ্চল পরিচিতি	১.১ ভূমিকা ১.২ গবেষণা অঞ্চলের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ১.৩ গবেষণা অঞ্চলের ভৌগোলিক বিবরণ ১.৪ গবেষণা অঞ্চলের সাংস্কৃতিক রূপরেখা ১.৫ উপসংহার
দ্বিতীয় অধ্যায়: ঘাটু গানের প্রেক্ষাপট	২.১ ঘাটু গানের বিষয়বস্তু ও সামাজিক প্রেক্ষাপট ২.২ বাঙালি রমণীর সৌন্দর্যের সন্ধান ও ঘাটু গানে নারীর আর্থসামাজিক অবস্থান ২.৩ ঘাটু গানের মধ্যে দিয়ে সমাজে নারীর প্রতিরূপায়ণ ২.৪ হুমায়ূন আহমেদের ঘেটুপুত্র কমলা ও তৎকালীন আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা
তৃতীয় অধ্যায়: ঘাটু গানে নারী শিল্পী	৩.১ পুরুষ কুশীলববৃন্দের দ্বারা অভিনীত নারী চরিত্র ৩.২ বাংলাদেশের অভিনয়ে নারী শিল্পীদের আর্থসামাজিক জীবন

চতুর্থ অধ্যায়: দেশী সাংস্কৃতিক উপস্থাপনার (পারফরমেন্স) সঙ্গে ঘাটু গানের তুলনা	৪.১ সংযাত্রা ৪.২ কালিকাছ ৪.৩ মহিষাসুর বধ
পঞ্চম অধ্যায়: বিদেশী সাংস্কৃতিক উপস্থাপনার (পারফরমেন্স) সঙ্গে ঘাটু গানের তুলনা	৫.১ আফগানিস্তানের বাচ্চাবাজী ৫.২ চীনের মেইল ডান ৫.৩ জাপানি আন্নাগাতা
ষষ্ঠ অধ্যায়: তাত্ত্বিক পর্যালোচনা	৬.১ প্রশ্নপত্র অনুসারে তথ্যবিশ্লেষণ ৪.৫ চরিত্র উপস্থাপনে সাংস্কৃতিক কৌশল ৪.৬ উপস্থাপনা কৌশল ও সামাজিক মূল্যায়ন
উপসংহার	উপসংহার
গ্রন্থপঞ্জি	গ্রন্থপঞ্জি

ঘাটু গানের সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট শীর্ষক এই গবেষণা কর্মটি পরিচালনার জন্য বিভিন্ন ধরনের সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হতে হয়েছে, যার মধ্যে সময়সীমা ও দ্বিতীয় পর্যায়ের তথ্যের অপ্রতুলতা অন্যতম। আমাদের দেশজ সংস্কৃতির বিলুপ্ত প্রায় প্রকরণ ঘাটু গান নিয়ে কাজ করতে গিয়ে মাঠ পর্যায়ে অনেক ধরনের প্রতিবন্ধকতার মুখে পড়তে হয়েছে। গবেষণা অঞ্চলের বিস্তৃতি ও তথ্যের অপ্রতুলতার দরুণ আমাকে সময়ের পাশাপাশি বিচিত্র সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়েছে। সর্বোপরি বাংলার ঐতিহ্যবাহী এই লোকজ ধারাটি নিয়ে কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার মুকাবেলা করে যথাযথ ভাবে অভিসন্দর্ভের উপস্থাপনের মধ্যে দিয়ে নিজেকে অনেক আত্মবিশ্বাসী ও গৌরবান্বিত মনে হয়েছে। এক্ষেত্রে সমস্ত

প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির নতুন উন্মাদনায় ঠুনকো হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে মুকাবেলা করে নতুন উদ্যমে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করেছি। যার ফলশ্রুতিতে আমার এই ক্ষুদ্র উপস্থাপন।

সুপারিশমালা:

ঘাটু গানের সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষপট নিয়ে কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা হয়। এক সময়ের সব থেকে জনপ্রিয় সংগীত ধারা আজ কালের গর্ভে হারিয়ে যেতে বসেছে, তবে প্রাণপ্রিয় এই সঙ্গীত ধারা আজ সমাজের বর্তমান সংস্কৃতি ও রীতিনীতির দ্বারা হুমকির সম্মুখীন। আমাদের দেশে ঘাটু গানের সংরক্ষণের জন্য নিম্নোক্ত সুপারিশগুলো করা হল:

আমাদের এই ঐতিহ্যবাহী ঘাটু গানকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সরকারী ও বেসরকারি পর্যায়ে কার্যকর উদ্যেগ গ্রহণ করতে হবে। এর পাশাপাশি স্থানীয় ভাবে এ গান চর্চা করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যে সব সাংস্কৃতিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয় সেখানে যথাযথ মর্যাদার সাথে এ গান উপস্থাপনের সুযোগ প্রদান করতে হবে। এর পাশাপাশি এ গানের শিল্পীদের প্রতি সমাজের মানুষের চিন্তা চেতনাকে সহযোগিতামূলক করে গড়ে তুলতে হবে। কারণ এই গানের সাথে যারা যুক্ত থাকেন বেশির ভাগ সময়েই দেখা যায় যে তাদেরকে অত্যন্ত সুকৌশলে অপবাদের আলোকে সমাজ থেকে ভিন্ন ভাবে দেখার চেষ্টা করা হয়। যা তাকে এই গান করা থেকে বিরত রাখে। ফলে এ গানের প্রসারের লক্ষ্যে মানুষের মধ্যে এর গ্রহণযোগ্যতাকে সামাজিক প্রেক্ষাপটের আলোকে যথাযথ মূল্যায়ণের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরতে হবে।

প্রথম অধ্যায়

গবেষণা অঞ্চল পরিচিতি

১.১ ভূমিকা

১.২ গবেষণা অঞ্চলের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

১.৩ গবেষণা অঞ্চলের ভৌগোলিক বিবরণ

১.৪ গবেষণা অঞ্চলের সাংস্কৃতিক রূপরেখা

১.৫ উপসংহার

গবেষণা অঞ্চল পরিচিতি

১.১ ভূমিকা: যে কোন অঞ্চল নিয়ে গবেষণা করার ক্ষেত্রে সেই অঞ্চলের ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে দিয়ে গবেষণা অঞ্চলের সীমানা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা সম্ভব হবে, যা এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় । এক সময় বাংলাদেশের ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা ও সিলেটের হাওড়াঞ্চলে ঘাটু গানের ব্যাপক প্রচলন ছিল । প্রাচীন জেলাগুলোর মধ্যে ময়মনসিংহ জেলা অন্যতম । বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পীঠস্থান হিসেবে পরিচিত নেত্রকোনা জেলা এক সময় বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। *ঘাটু গানের সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট* শিরোনামে অভিসন্দর্ভ রচনায় উক্ত অঞ্চলের ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট অন্যতম প্রভাবক হিসেবে কাজ করবে বলে আমি মনে করি।

১.২ গবেষণা অঞ্চলের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট: মজুমদার (১৯০৪) বলেন, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনামালে প্রশাসনিক সুবিধা বৃদ্ধি, রাজস্ব আদায় ও স্থানীয় বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে ১৭৮৭ সালের ১মে ময়মনসিংহ জেলা প্রতিষ্ঠিত হয়। ধারণা করা হয় যে 'মমিনশাহী'র পরিবর্তিত রূপ হচ্ছে বর্তমান ময়মনসিংহ। দিল্লীশ্বর আকবরসাহের সময়ে মমিনশাহ নামের কোন এক ব্যক্তি সরকার বাজুহার একাংশের অধীশ্বর ছিলেন। সেই মমিনসাহ হতেই তার অধিকৃত মহালের নাম হয় মমিনসাহী। আইন-ই আকবরই-গ্রন্থে মমিনশাহী মহালের নাম পাওয়া যায়। এই মমিন'সাহী' শব্দই লিপি-বিড়ম্বনায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে সিংহ রূপ ধারণ করে বর্তমান 'মৈমনসিংহে' পরিণত হয়েছে। মৈমনসিংহ বা ময়মনসিংহ রাজস্বে এ জেলার সর্ব প্রধান পরগণা। পরগণা মমিনসাহী বা মৈমনসিংহের গবর্মেন্ট রাজস্ব সর্বাপেক্ষা অধিক বলে এ জেলা ময়মনসিংহ নামে অভিহিত হয়েছে (পৃ: ৩-৫)।

ময়মনসিংহ বাংলাদেশের একটি অতি পুরনো জেলা। ইতিহাসের পাঠ থেকে আমরা জানতে পারি, শুরুতে এখনকার বেগুনবাড়ির কোম্পানিকুঠিতে জেলার কাজ শুরু হয় তবে পরবর্তী সময়ে সেহড়া মৌজায় ১৭৯১ সালে তা স্থানান্তরিত হয়। আদি ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন স্থান সিলেট, ঢাকা, রংপুর ও পাবনা জেলার অংশ হয়ে পড়ে। পর্যায়ক্রমে ১৮৪৫ সালে জামালপুর, ১৮৬০ সালে কিশোরগঞ্জ, ১৮৬৯ সালে টাঙ্গাইল ও ১৮৮২ সালে নেত্রকোনা মহকুমা গঠন করা হয়। পরবর্তী সময়ে সবকটি মহকুমা জেলায় উন্নিত হয়। হক (২০০৫) বলেন, ১৭৮৭ সালে পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজউদদৌলার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে শুরু হয় ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানির শাসন। নেত্রকোনাও তখন ব্রিটিশশাসিত অঞ্চলে পরিগণিত হয়। এর কিছুকাল পরেই ফকির-সন্যাসী বিদ্রোহসহ পশ্চিম ময়মনসিংহে বিদ্রোহ আর অরাজকতা দেখা দিলে ১৭৮৭ সালের ১ মে তারিখ ময়মনসিংহ জেলার পত্তন ঘটে। ইংরেজ প্রশাসক ডব্লিউ রটন এ জেলার প্রথম কালেকটর নিযুক্ত হন। বর্তমান নেত্রকোনা অঞ্চলও তখন ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। ময়মনসিংহ জেলা হওয়ার প্রায় ৮৭ বছর পর অর্থাৎ ১৮৭৪ সালে নেত্রকোনা ও দুর্গাপুরে দুটি পৃথক থানার সৃষ্টি হয়। এর কয়েক বছর পর ১৮৮২ সালের ৩ জানুয়ারি নেত্রকোনা ও দুর্গাপুর থানা নিয়ে নেত্রকোনা মহকুমা স্থাপিত হয়। অবশেষে ২৮১০ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের নেত্রকোনা মহকুমা সৃষ্টির প্রায় ১০২ বছর পর ১৯৮৪ সালে মহকুমাকে জেলায় উন্নীত করা হয়।

নেত্রকোনা জেলার ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থান সমূহের মধ্যে- গারো পাহাড়, কেন্দুয়ার বোয়াইল বাড়ি দুর্গ, খোঁজার দিঘি, দুর্গাপুরের সুসং মহারাজার বাড়িসহ ইত্যাদি অন্যতম। এ জেলার ঐতিহাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোর মধ্যে দত্ত হাই স্কুল, পূর্বধলার নারায়ণ ডহর ইংরেজি মাইনর উচ্চ বিদ্যালয়, ধর্মরায় রামধন উচ্চ বিদ্যালয় আটপাড়াসহ নেত্রকোনাতে ১৬ টি

কলেজ, দেড়শতাধিক হাই স্কুল, শতাধিক জুনিয়র স্কুল, সহস্রাধিক প্রাইমারি স্কুল এবং ৭০ টি মাদ্রাসা রয়েছে (পৃ: ৩৯ ও ৪৬)।

বাংলাদেশ সরকারের জেলা তথ্য বাতায়নের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, সুনামগঞ্জের ইতিহাস অতি প্রাচীন। সেই সাথে অসংখ্য ঐতিহাসিক ঘটনাবলী, কিংবদন্তী ও তথ্যাবলিতে ভরপুর। প্রাচীন ইতিহাস থেকে অনুমান করা হয়, সুনামগঞ্জ জেলার সমগ্র অঞ্চল এককালে আসামের কামরূপ বা প্রাগজ্যোতিষপুর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। বৃহত্তর সিলেট সুদূর অতীতে ভিন্ন ভিন্ন তিনটি স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এ রাজ্যগুলো হচ্ছে লাউড়, গৌড় ও জয়ন্তিয়া। অনুমান করা হয় এই লাউড় রাজ্যের সীমানা বর্তমান সমগ্র সুনামগঞ্জ জেলা ও ময়মনসিংহ জেলা এবং হবিগঞ্জ জেলার কিয়দাংশ নিয়ে গঠিত। লাউড় রাজ্যের নৌঘাঁটি ছিল দিনারপুর নামক স্থানে। যা বর্তমান হবিগঞ্জ জেলার অন্তর্গত। রাজধানী লাউড় থেকে নৌঘাঁটি পর্যন্ত সারা বছর চলাচল উপযোগী একটি ট্রাংক রোডের অস্তিত্ব সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের সমর্থন পাওয়া যায়। অনুমান করা হয়, সুনামগঞ্জ জেলার বেশির ভাগ অঞ্চল এককালে একটি সাগরের বুকে নিমজ্জিত ছিল যা কালে কালে পলি ভরাট জনিত কারণে ও ভূ- প্রাকৃতিক পরিবর্তনের সূত্র ধরে ভূখণ্ডে পরিণত হয়েছে। সুনামগঞ্জের ভূগর্ভে চুনা পাথরের খনি ও কয়লা আবিষ্কারের ফলে এরূপ চিন্তার সক্রিয় সমর্থন পাওয়া যায়। এছাড়া এখানকার শত শত হাওরের গঠন প্রকৃতি (basin type) বিশ্লেষণ করেও এ মতের সমর্থন দৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে যায়। হাওর শব্দটি সায়র (সাগর) থেকে এসেছে। বর্ষাকালে সুনামগঞ্জের হাওরগুলো এখনো সে রূপই ধারণ করে।

১.৩ গবেষণা অঞ্চলের ভৌগোলিক বিবরণ: মানুষের আচার-আচরণ ও শিক্ষা-সংস্কৃতির উপর তার ভৌগোলিক পরিবেশের অবদান অনস্বীকার্য। তাই ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা অঞ্চলের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য এর ভৌগোলিক অঞ্চলের বিবরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের উত্তরাংশের জেলা হচ্ছে ময়মনসিংহ। যার উত্তরে গারো পাহাড় ও আসামের গোয়ালপাড়া জেলা অবস্থিত। এ জেলার পশ্চিমে টাঙ্গাইল ও জামালপুর জেলা, দক্ষিণে গাজিপুর জেলা এবং পূর্বে কিশোরগঞ্জ জেলার অবস্থান। খান (২০১৩) বলেন, ১৭৮৭ সালের ১ মে ময়মনসিংহ জেলার প্রতিষ্ঠাকালের জেলার আয়তন ও সীমা বর্তমান সময়ের জেলা আয়তন ও সীমার মধ্যে রয়েছে বিস্তর ব্যবধান।

মানচিত্র-১ ময়মনসিংহ জেলা

তিনি উল্লেখ করেন বর্তমানে ময়মনসিংহ জেলার অবস্থান ২৪° ০২′ ০৩′′ থেকে ২৫° ২৬′৫৬′′ উত্তর অক্ষাংশের ৮৯° ৩৯′ থেকে ৯১° ১৫′ ৩৫′′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে। এই জেলার মোট আয়তন ৪৫৮৫.৫৬ বর্গ কি. মি। লোকসংখ্যা ৩৫,৭৭,৩৭৯ জন (পৃ: ১৯)।

ইতিহাসের পাঠ থেকে আমরা জানতে পারি, ১৯৮৪ সালে নেত্রকোনা জেলা প্রতিষ্ঠিত হয়।

মানচিত্র-২ নেত্রকোনা জেলা

এ জেলার আয়তন ২,৪৭৭ বর্গ কিলোমিটার এবং মোট উপজেলার সংখ্যা ১০ টি। যথা নেত্রকোনা সদর, মোহনগঞ্জ, মদন, খালিয়াজুরি, কেন্দুয়া, দুর্গাপুর, কলমাকান্দা, আটপারা, বারহাট্টা ও পূর্বধলা। এ জেলার মোট ইউনিয়ন ১২১ টি ও গ্রামসংখ্যা ২২৭৯ টি। প্রধান প্রধান নদ- নদীর মধ্যে কংস, বাউলাই, ধনু, মুগরা, সমেশ্বর, ও পাটকুরা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ জেলার মোট জনসংখ্যা ১৯,৩৭,৭৯৪ জন। এর মধ্যে পুরুষ- ৫০.৭১% এবং মহিলা- ৪৯.২৯%। শিক্ষার হার- ২৬.০০%। বিশিষ্ট ব্যক্তি বৃন্দের মধ্যে রয়েছেন- কর্নেল তাহের খান, খান বাহাদুর কবির উদ্দিন খান, মুহম্মদ জাফর ইকবাল, হুমায়ূন আহমেদসহ প্রমুখ।

জেলা তথ্য বাতায়নের আলোকে আমরা দেখতে পাই, বাংলাদেশের উত্তরপূর্ব সীমান্তে খাসিয়া জৈন্তা পাহাড়ের কোলঘেঁষে সুনামগঞ্জ জেলার অবস্থান। এ জেলার উত্তরে রয়েছে ভারতের মেঘালয়, দক্ষিণে হবিগঞ্জ জেলা, পূর্বে সিলেট জেলা ও পশ্চিমে নেত্রকোনা জেলা। সুনামদি নামক জনৈক মোগল সিপাহীর নামানুসারে সুনামগঞ্জের নামকরণ হয়েছিল বলে জানা যায়। সুনামদি (সুনাম উদ্দিনের আঞ্চলিক রূপ) নামক উক্ত মোগল সৈন্যের কোনো এক যুদ্ধে বীরোচিত

কৃতিত্বের জন্য সম্রাট কর্তৃক সুনামদিকে এখানে কিছু জমি পুরস্কার হিসেবে প্রদান করা হয়। তাঁর দানস্বরূপ প্রাপ্ত ভূমিতে তাঁরই নামে সুনামগঞ্জ বাজারটি স্থাপিত হয়েছিল। এভাবে সুনামগঞ্জ নামের ও স্থানের উৎপত্তি হয়েছিল বলে মনে করা হয়ে থাকে।

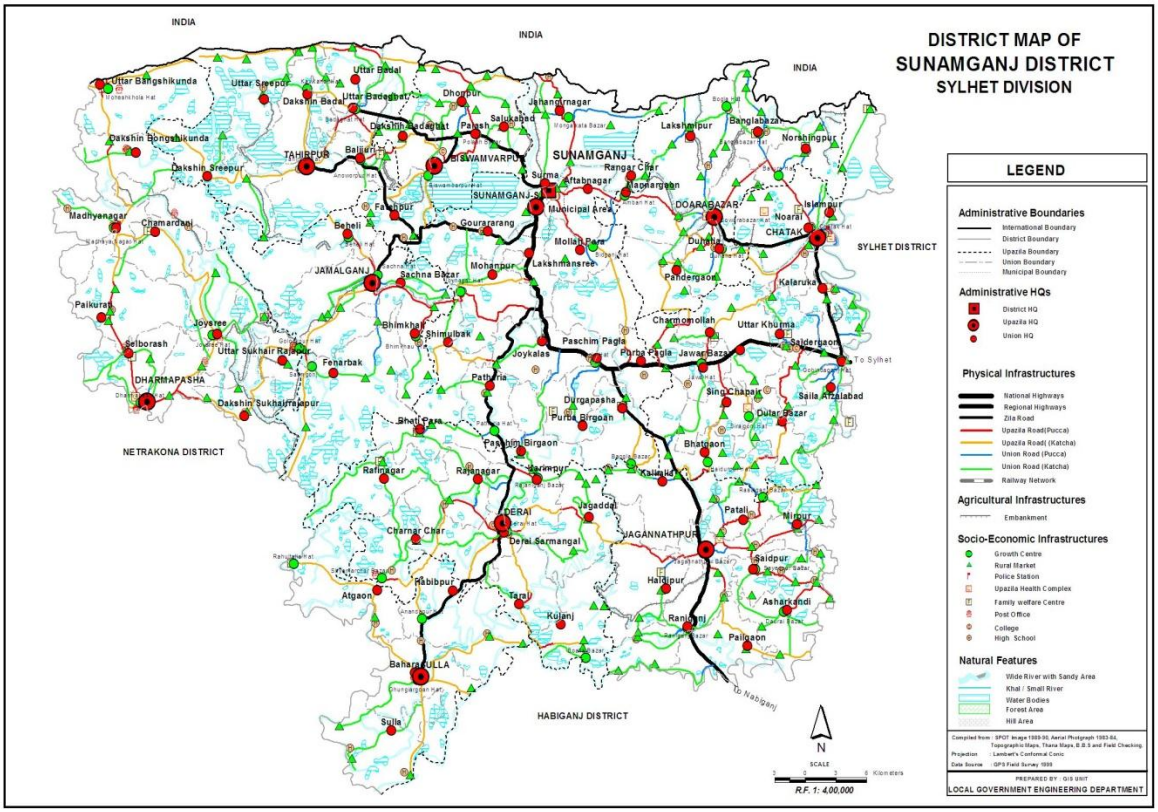

মানচিত্র-৩ সুনামগঞ্জ জেলা

সুনামগঞ্জ জেলার আয়তন ৩,৬৬৯,৫৮ বর্গ কি.মি.। এ জেলায় বদ্ধ জলমহাল রয়েছে ৯৯৭ টি, ২০ একরের মধ্যে ৪১৮ টি এবং অনূর্ধ্ব ২০ একরের মধ্যে রয়েছে ৫৭৯ টি। উন্মুক্ত জলমহাল ৭৩ টি। মোট জনসংখ্যা ২০,১৩,৭৩৮ জন (২০০১ সালের আদম শুমারি অনুযায়ী)। এর মধ্যে পুরুষ- ১০,৩৬,৬৭৮ জন এবং মহিলা- ৯.৭৭,০৬০ জন। সার্বিক স্বাক্ষরতার হার- ৪৯.৭৫% (পুরুষ-৫০%, মহিলা- ৪৯.৫%) এবং শিক্ষিতের হার- ২৫%। বিশিষ্ট ব্যক্তি বৃন্দের মধ্যে রয়েছেন – শাহ আবদুল করিম, দেওয়ান হাসন রাজা, রাধারমন ও দূরবীন শাহ সহ প্রমুখ।

১.৪ গবেষণা অঞ্চলের সাংস্কৃতিক রূপরেখা: খান (২০১৩) বলেন, বাংলাদেশের প্রধান কয়েকটি নদীর মধ্যে ব্রহ্মপুত্র অন্যতম। ময়মনসিংহ সদর উপজেলার বুক চিরে প্রায় দ্বিখণ্ডিত করে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বয়ে গেছে এই নদী । ব্রহ্মপুত্রের আদিনাম লৌহিত্য । ব্রহ্মপুত্রসহ প্রচুর নদি-নালা রয়েছে ময়মনসিংহের বিভিন্ন অঞ্চলে৷ ময়মনসিংহে হাওড় না-থাকলেও নেত্রকোনা অঞ্চলে রয়েছে হাওড়ের অস্তিত্ব। ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনাতে অবস্থিত প্রচুর খাল-বিল ও হাওড় এসব অঞ্চলের লোকজ সংস্কৃতির উপাদান তৈরিতে কিংবদন্তি ও লোকশ্রুতির মধ্যে দিয়ে ভূমিকা রেখে আসছে। ব্রহ্মপুত্র, ধলেশ্বরি, কংস, মগড়, ধনু, সমেশ্বরী, সুতিয়া, নিতাই, বংশী, ঝিনাই, বানার প্রভৃতি নদ-নদী, উপনদী ও শাখানদী সমূহ এ অঞ্চলের উপর দিয়ে প্রবাহিত । এসব নদ-নদী ময়মনসিংহের মানুষের জীবন-জীবিকায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। এ অঞ্চলে বিশাল বনাঞ্চল থাকায় যেমন শিকারজীবীর উদ্ভব হয়েছিল, তেমনি বিশাল জলরাশি থাকায় উদ্ভব ঘটেছিল মৎস্যজীবীর। ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনাতে যে সব বিল রয়েছে- এসব বিলগুলো একই সাথে ধান ও মাছের প্রধান উৎস। বিলগুলোকে কেন্দ্র করে অনেক লোকশ্রুতিও দীর্ঘকাল ধরে ঐতিহ্য সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখে আসছে। আবার এসব বিলের পাশেই গড়ে উঠেছে বিভিন্ন গ্রাম। প্রতিটি গ্রামেরই রয়েছে আলাদা বৈশিষ্ট্য। তার কারণ হচ্ছে বিলসমূহের ভৌগোলিক অবস্থান। যেমন – কুল্লা বিলে প্রচুর কচু জন্মে আর মাটি খুব কালো। বিলটি ছোট, তার চারপাশে বাড়ি বা গ্রাম। তাই এ বিলকে কেন্দ্র করে যেসব লোকজ সংস্কৃতি সৃষ্টি হয়েছে, তা একান্নবর্তী পরিবারকেন্দ্রিক। অন্যদিকে শুনকি বা হিঙ্গাদুলি বিলের চারপাশের বাড়ি বা গ্রামসমূহ অনেক দূরে অবস্থিত। বিলের চারদিক ফাঁকা মাঠ বা কান্দা। তাই এসব বিলে দলগত লোকসাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে এবং এগুলো অপেক্ষাকৃত আদি রসাত্মক। যেমন – ঘাটু গান। চারদিক নীরব বলে এখানে ঢোল বাজিয়ে গান করতে সুবিধা হয়। বদলা বিলে শুধু মাছ আর ধানই উৎপন্ন হয় না। এ বিল থেকে কুমার বা পালরা দুই ধরনের এঁটেল মাটি সংগ্রহ করে বিভিন্ন ধরনের গৃহস্থালী ও রান্না-বান্নার কাজের জিনিসপত্র এবং লোকজমেলার বিক্রয়যোগ্য বিভিন্ন ধরনের খেলনা তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করেন । আর এভাবেই এই জেলার বিলসমূহ প্রাকৃতিক সম্পদসহ লোকজ সংস্কৃতি এবং মানবসম্পদের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে (পৃ:২১-২৪)।

আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন আউল-বাউল ও কবি-সাহিত্যিকদের লীলাভূমি হচ্ছে ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা অঞ্চল৷ লোকসঙ্গীত বাঙালি জাতির লোকসংস্কৃতির অত্যন্ত সমৃদ্ধতম শাখা। লোকসঙ্গীতের সুর, তাল ও লয় এতোই মনোরম যে তা সমস্ত মানুষের হৃদয়ে শান্তির পরশ বুলিয়ে যায়। এ গানের ভাষায় আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার সমাজের সর্বস্তরের মানুষের প্রাণ ছুঁয়ে যায়। লোকসঙ্গীতের বিভিন্ন সমৃদ্ধতম শাখার সন্ধান আমরা পেয়ে থাকি ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা অঞ্চলে৷ ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা জেলার প্রায় প্রতিটি উপজেলাতেই কমবেশি বিভিন্ন ধরনের লোকসঙ্গীতের সন্ধান মেলে, তার

মধ্যে মাজারের গান, উড়ি গান, কর্মসঙ্গীত, গাইনের গীত, মেয়েলী গীত, ভাটিয়ালি, বিভিন্ন ধরনের গাথা, জারি গান, কবি গান, একদিল গান, বিষহরির পাঁচালি, পালাগান, বাইদ্যার বা বাইদ্যানির গান, গাজির গান এবং ঘাটু গান অন্যতম।

হক (২০০৫) বলেন, শত শত বছরব্যাপী হাজারো কবিগায়কের সুর লহরী আজও এখানে তরঙ্গায়িত হয়। যাঁদের হাতে বাংলা সাহিত্যের হাতেখড়ি, বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও প্রথম নিদর্শন, একমাত্র প্রাচীন কাব্য, 'চর্যাপদ গীতিকার' অন্যতম প্রধান বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য ও চর্যাপদকর্তা কাহ্নপার বাড়ি ছিল নেত্রকোনা – এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন অনেক গবেষক৷ রাজেশ্বরী নদীর তীরে কেন্দুয়ার বিপ্র গ্রামের কবি কংকের 'বিদ্যাসুন্দর'ই বাংলা বিদ্যাসুন্দর কাব্যের প্রথম গ্রন্থ৷ মধ্যে যুগের কবি কংকই বাংলা সাহিত্যে সত্যপীরের পাঁচালি কাব্যের আদি রচয়িতা।

তিনি উল্লেখ করেন, ১৯২৩ সালে ড. দীনেশ চন্দ্র সেনের সম্পাদনায় 'মৈমনসিংহ গীতিকা' প্রকাশিত হলে সারা বাংলা মুলুকের সাহিত্য অঙ্গনে সাজ সাজ রব পড়ে যায়। বাংলার গণ্ডি পেড়িয়ে সেই গীতিকা বিশ্ব সাহিত্যে ভাণ্ডারে মহামূল্যবান রত্নরাজিতে পরিণত হয়। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী অধ্যায় বলে বিবেচিত এই গীতিকা সংকলনের প্রাণপুরুষ ছিলেন কেন্দুয়ার সন্তান চন্দ্রকুমার দে। চন্দ্রকুমার দের জন্ম না হলে মহুয়া-মলুয়া-চন্দ্রাবতীর মত সমৃদ্ধ গীতিকার প্রকাশ সম্ভব ছিল না। এই চন্দ্রকুমার দে, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দলনের উত্তাল সময়ের ঐতিহাসিক দিনগুলোতে নেত্রকোনা তথা বৃহত্তর ময়মনসিংহের লোকজ পালাগানের নৈবেদ্য নিয়ে অবিভক্ত বঙ্গের সুধীসমাজে এসে হাজির হন। অসমতল পার্বত্য অঞ্চল, গহীন জঙ্গলাকীর্ণ নিবিড় প্রান্তর, দূর তেপান্তর ও দুস্তর পথঘাট বিস্তীর্ণ হাওর-বিল, খরস্রোতা নদী ও স্রোতস্বিনী, পালতোলা নৌকা ও বড় বড় পানসি ও পাতামের সারি, নল খাগড়া আর ইক্রার বন, জলাভূমির বর্ষায়সিক্ত সারি সারি হিজল গাছ- এসবই হল ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনার প্রকৃত রূপ। তিনি বলেন, এ রূপ কাহিনীই বর্ণিত হয়েছে ময়মনসিংহ গীতিকার পালাগানে। হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির অপূর্ব সম্মিলনে এক অনবদ্য উপস্থাপনায় সমৃদ্ধ নেত্রকোনার লোকসাহিত্য (পৃ: ৪৮-৫১)।

সুনামগঞ্জ জেলা বিপুল পরিমাণ সাংস্কৃতিক উপাদানে ভরপুর। জেলা তথ্য বাতায়নের সূত্র ধরে আমরা পাই, সুনামগঞ্জের পল্লী ও লোকসংস্কৃতিতে মাঝির ভরাট গলার গান ও রাখালের বাঁশির সুর। এ অঞ্চলের হিন্দুমুসলিম, আউল, বাউল, পীর, ফকির, দরবেশ ও বৈষ্ণবসন্ন্যাসীদের অসংখ্য সৃষ্টিশীল গান যা মানুষকে মুগ্ধ করে এবং পরমেশ্বরের সন্ধান পেতে সাহায্য করে। এখানকার লোকজ সংস্কৃতি আমাদের জাতীয় জীবনের অমূল্য ভাণ্ডার। এক কথায় জারি, সারি আর ভাটিয়ালির দেশ সুনামগঞ্জ।

১.৫ উপসংহার: পূর্বের মতো বর্তমানেও ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা অঞ্চল বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। যদিও বর্তমান সময়ে মানুষের ব্যক্তিক ও পারিবারিক জীবনে ব্যস্ততা পূর্বের তুলনায় অনেকগুণ বেড়েছে, তবুও এ অঞ্চলের মানুষ তাদের কর্মময় ব্যস্ত জীবনে একটুখানি অবসর পেলেই নিজেদেরকে সংস্কৃতির বিভিন্ন মাধ্যমে নিমজ্জিত করে রাখেন। এর মধ্যে দিয়ে তারা নিজেরা যেমন তাদের অন্তরের সাংস্কৃতিক পিপাসা নিবারণ করেন তেমনি বাংলার অগণিত সংস্কৃতি পিপাসু মানুষের আত্মার খোরাকের যোগানদার।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঘাটু গানের প্রেক্ষাপট

২.১ ঘাটু গানের বিষয়বস্তু ও সামাজিক প্রেক্ষাপট

২.২ ঘাটু গানে শিল্পীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান

২.৩ ঘাটু গানের মধ্যে দিয়ে সমাজে নারীর প্রতিরূপায়ণ

২.৪ হুমায়ূন আহমেদের ঘেটুপুত্র কমলা ও তৎকালীন আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা

২.১ ঘাটু গানের বিষয়বস্তু ও সামাজিক প্রেক্ষাপট: আমাদের ঐতিহ্যবাহী লোকসংস্কৃতির অন্যতম উপাদান হচ্ছে ঘাটু গান। এক সময়ে নেত্রকোনার বিভিন্ন গ্রামেগঞ্জে এ গানের ব্যাপক জনপ্রিয়তা ছিল। নেত্রকোনার পাশাপাশি সিলেটের গোটা হাওর অঞ্চল ও পূর্ব ময়মনসিংহ অঞ্চলে এ গান প্রসারতা লাভ করে। ঘাটু গানের উচ্চারণ নিয়ে বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে৷ কোন কোন অঞ্চলে এ গান ঘাঁটু, ঘেটু, ঘেঁটু, গেন্টু, ঘাড়ু, গাড়ু, গাঁটু নামে প্রচলিত। ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা অঞ্চলে এ গান ঘাটু ও গাড়ু নামেই অধিল প্রচলিত। শিক্ষিত মহলে এ গান ঘাটু নামেই পরিচিত। আবার অক্ষর জ্ঞানহীন সাধারণ মানুষেরা একে গাড়ু নামেই ডেকে থাকেন। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে উক্ত অঞ্চলের মানুষেরা 'ট' এর পরিবর্তে 'ড' উচ্চারণ করে থাকেন, যেমন: মাটি> মাডি, ঘাট>গাট, দুইটা>দুইডা ইত্যাদি। ঠিক এমনি ভাবে ঘাটু থেকে গাড়ু শব্দের উৎপত্তি৷ কিন্তু বিভিন্ন কবি- সাহিত্যিক ও গবেষকদেরকে সাহিত্যের পাতায় একে ঘাটু নামেই উল্লেখ করতে দেখা যায়। ঘাটু গানের নামকরণের ইতিহাস সম্পর্কে পণ্ডিতবর্গ ভিন্ন ভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। সাধারণের ধারণা ঘাটে ঘাটে নৌকা ভিড়িয়ে এ গান গাওয়া হয় বলে এর নামকরণ করা হয়েছে ঘাটু গান। ঘাটু গান পরবর্তীতে ঘাটু যাত্রা নামেও পরিচিতি লাভ করেছিল। পণ্ডিত-বর্গের মতে ঘাটু গানের সাথে যাত্রা শব্দটি যুক্ত হয়ে ঘাটুযাত্রা বা ঘেঁটু যাত্রার উৎপত্তি ঘটে। এ প্রসঙ্গে দীন (১৯৯৬) বলেন, ঘেঁটুগানের সঙ্গে ঘেঁটুযাত্রার একদিক থেকে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। সচরাচার গীতি-নৃত্যাশ্রিত যে কোন নাট্যের ক্ষেত্রে ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে এদেশে যাত্রা কথাটি ব্যবহৃত হতে থাকে। যেমন মূলে রামলীলা, উত্তরকালে রামযাত্রা এবং রামলীলা উভয় নামেই অভিহিত হতে থাকে। আবার ঘেঁটুগানের সঙ্গে ঘেঁটুযাত্রার পরিবেশনীয় কাহিনী ও বিষয়ের ভিন্নতা আছে। ঘেঁটুযাত্রায় যে কোন প্রণয়কাহিনী, এমনকি গুনাইবিবি, রহিমবাদশা, রূপভান কন্যা, আলোমতি প্রেমকুমার, সাগর ভাসা, অরুণ শান্তির মত যাত্রাপালার কাহিনী গৃহীত হয়ে থাকে। অন্যদিকে যাত্রাপালায় সমকালে নারী চরিত্র নারীদের দ্বারাই নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু ঘেঁটুযাত্রায় কদাচিৎ নারী, সচরাচার কিশোর বা রূপবান বালক নারী চরিত্রে অভিনয় করে। ঘেঁটুযাত্রায় সংলাপ কম, নৃত্য ও গীতের আধিক্য বিদ্যমান। যাত্রায় কদাচিৎ দোহার থাকে, ঘেঁটুযাত্রার গীতে দোহারের ভূমিকাই মুখ্য। যাত্রার নৃত্য বিনোদনরূপে, নাট্য বহির্ভূত নৃত্য-কৌতুক সংযুক্ত হয়। ঘেঁটুযাত্রা নৃত্য নির্ভর এবং এসকল নৃত্য সর্বত্র খেমটা নৃত্য (পৃ: ১৩৯ - ১৪০)।

খান (২০১৩) বলেন, শাশ্বত বাংলার লোকসঙ্গীতের যে রূপ তার সবটাই জুড়ে ঘাটুগান [যদৃষ্টং] বিদ্যমান। ঢোল, করতাল, হারমোনিয়াম, জুরি সহযোগে যখন এই গান ও নৃত্য পরিবেশিত হয় তখন এ গানের বিষয় ও প্রেক্ষাপটে তাই ফুটে ওঠে৷ ময়মনসিংহ জেলার ময়মনসিংহ সদর, ফুলবাড়িয়া, ভালুকা, মুক্তাগাছা, ত্রিশাল উপজেলায় এই গানের প্রচলন বেশি৷ এখনও এই অঞ্চলে ঘাটু সমানভাবে জনপ্রিয়। ভালুকা উপজেলায় এই সঙ্গীত ঘেটু নামে পরিচিত বেশি। ত্রিশাল, ঈশ্বরগঞ্জে

গাড়ু গান আর ময়মনসিংহ সদরে ঘাটু গান হিসেবে পরিচিত। বর্তমানে ঈশ্বরগঞ্জ, ফুলপুর, হালুয়াঘাট, ধবাউড়ায় ঘাটু গানের প্রচলন নেই। ঘাটু গানে একজন থাকেন মূল গায়ক, বাকিদের বলা হয় বাহার। মূল গান করেন বয়াতি, আর বাহাররা একত্রে ধোয়া গায়, শরীর দুলিয়ে সুরের সাথে হাততালি দেয়, মাথা নাড়ে আর একত্রে উচ্চধ্বনি করে উঠে। ঘাটু গানের দর্শকের মূল আকর্ষণ হচ্ছে ছুকরি। অল্পবয়সি ছেলেদের সাধারণত মেয়ে সাজিয়ে ছুকরি করা হয়। তবে কেউ কেউ এখন মেয়েদেরকেই ঘাটু মঞ্চে উপস্থাপন করে থাকেন। গানের তালে তালে নৃত্য পরিবেশন করে থাকে ছুকরি। ঘাটু গানে ঢোলক, করতাল, খঞ্জরী, জুড়ি, হারমোনিয়াম প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বাহারদের সাধারণ পোশাকই পরিধান করতে দেখা যায়, তবে বয়াতি আর ছুকরির পোশাক ভিন্ন থাকে। বয়াতি রঙ্গিন পাঞ্জাবি, লুঙ্গি, গলায় গামছা পরিধান করেন আর ছুকরিকে শাড়ি, গয়না ইত্যাদি সাজসজ্জা করতে দেখা যায়। ঘাটুগান বন্দনা দিয়ে শুরু হয়। দেব-দেবী বন্দনার পর হিন্দু-মুসলমান উপস্থিত সবাইকে সালাম জানায় এবং উস্তাদের নাম স্মরণ করেন। মাঝে মাঝে ছম গান করেন, এর মাঝে আদিরসাত্মক কথাও স্থান পায়। ঘাটুগানগুলো অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, চার-ছয় চরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই চরণগুলোই তারা ঘুরে ফিরে বারেবারে বলতে থাকেন।

চিত্র-১ : ঘাটু গান, নেত্রকোনা। (ছবি: সাইমন জাকারিয়া)

ঘাটু গানে সাধারণত দুজন ঘাটুর সাথে দুইটি পক্ষ নিয়ে নাচ-গান পরিবেশন করা হয়। এক পক্ষ হচ্ছে রাই আর অন্য পক্ষ হচ্ছে শ্যাম। রাই চরিত্রে কিশোর বয়সের ছেলেরা মেয়েদের সাজ গ্রহণ করে অভিনয় করে আর শ্যাম চরিত্রে ছেলেরা নিজেদের অবস্থান থেকেই অংশগ্রহণ করে। ঘাটু গানের ক্ষেত্রে একজন উস্তাদ থাকেন যিনি দলনেতার ভূমিকা পালন করেন। আর তার সঙ্গে থাকেন একাধিক পাইল বা দোহার যারা বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র বাজানো ও হাততালির মধ্যে দিয়ে গানের ধোয়া ধরেন। ঘাটু গানে সাধারণত ঢোল, করতাল, হারমোনিয়াম, মন্দিরা, চটি ও বিভিন্ন ধরনের লোকবাদ্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ঘাটু গানে দর্শকদের জন্য আনন্দের অন্যতম উৎস হল বাহার। বাদ্যযন্ত্রের তালের সাথে উচ্চস্বরের বাহার কিছুক্ষনের জন্য দর্শকদের মাতিয়ে তোলেন। বাহারে অংশ নেয় দোহার বা পাইলেরা। একটি অন্যতম বাহারের উদাহরণ হচ্ছে- ওরে হে চাবুল বুল চাবুল/ বেশ বেশ।।

চিত্র-২ : ঘাটু গান, ময়মনসিংহ। ছবি: সংগৃহীত

ঘাটু গানে রাইয়ের জন্য আভিজাত্যপূর্ণ কাতান বা বেনারসী শাড়ি ব্যবহৃত হয়। শাড়ির মাঝে বিভিন্ন ধরনের রঙিন নকশা করা থাকে। আর শ্যাম চরিত্রে যে অংশগ্রহণ করে সে ঐতিহ্যবাহী রাজা-বাদশাদের মখমলের কাপড়ের উপর নকশা করা পোশাক পরিধান করে। অনেক সময় শুধু শ্যাম বা শ্যাম ও রাই উভয়েই মুকুট পরিধান করে থাকে। ঘাটু গানের জন্য আলাদাভাবে কোন মঞ্চ তৈরি করা হয় না। খোলা মাঠে বা কোন গৃহস্থের বড় কোন উঠানের মাঝখানে পাটি পেতে এ গান পরিবেশন করা হয়। আর দর্শকেরা গোল হয়ে বসে ও দাঁড়িয়ে ঘাটু গান উপভোগ করে থাকেন। ঘাটু গানের শুরু হয় বন্দনার মধ্যে দিয়ে। রাই চরিত্রের ঘাটু আসরে এসে প্রথমে উস্তাদ ও পর্যায়ক্রমে দর্শক ও অন্যান্যদের সাথে করমর্দন করে

বন্দনা পরিবেশন করে। বন্দনার শেষে রাই নিজের পরিচয় জ্ঞাপক গান পরিবেশন করে শ্যামের উদ্দেশ্যে প্রশ্নমূলক গান পরিবেশন করে। যেমন-

রাই: শ্যাম বলি যে তোরে

যেদিন মায়ের গর্ভে ছিলে

সেইদিন খাইছ কী৷

দোহার: শ্যাম বলি যে তোরে

ওরে জানলে কথা

বইল-অ আমারে

একটি কথা প্রশ্ন করি তোরে৷৷

রাই: শ্যাম বলি যে তোরে

কোন দিঘিতে বইসা আর

শুইয়া ছিলে

শিথান দিছস কী —

এর মধ্যে দিয়ে রাই গানে গানে প্রশ্ন করে আসরে বসে যাবে। তারপর শ্যাম উঠে প্রথমে বন্দনা ও পরে পরিচয়মূলক গান পরিবেশন করে রাইয়ের দেয়া প্রশ্নের উত্তর দিবে। আর এভাবেই প্রশ্ন উত্তরের মধ্যে দিয়ে ঘাটু গান জমে উঠে। মূলধারার ঘাটু গানের ফাঁকে ফাঁকে দর্শকদের আনন্দ দেবার জন্য পরিবেশন করা হয় আনন্দমূলক গান। আর এই গানের সাথে যে নাচ পরিবেশন করা হয় তা খেমটা নামে পরিচিত। আনন্দমূলক কয়েকটি গানের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে- ১.

রাই: কে দিল পিরিতের বেড়া লিচুরও বাগানে।

ছোট ছোট লিচুগুলি

বন্ধু তুলে আমিও তুলি

বন্ধু দেয় আমার মুখে

আমি দেই বন্ধুর মুখে।৷

২.

রাই: ভাইসাবরে তুই জলে ভাসা

সাবান কিন্যা দিলি না।।

সাবান কিন্যা দিলি নারে।।

যুদি কর আমার আশা

সাবান আইনো জলে ভাসা

নইলে থাকবে মন ভাসা

আমার দেখা পাইবে না ।।

ঘাটু গানের সবার শেষে পরিবেশিত হয় কৃষ্ণ সন্ন্যাস। এই অংশের পর আর কোন ঘাটু গান পরিবেশন করা হয় না। কৃষ্ণ সন্ন্যাসের মধ্যে দিয়ে মূলত ঘাটু গানের পরিসমাপ্তি টানা হয়। ঘাটু গানের পংক্তি সংখ্যা সাধারণত চার থেকে ছয় এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এর মধ্যেই মূলভাব ও সারকথা প্রকাশ পায়। ঘাটু গানের শিল্পীরা গ্রামের সাধারণ মানুষ। তারা বিভিন্ন শ্রেণী পেশার সাথে সম্পৃক্ত। তারা তাদের নিত্যদিনের অভাব অনটনের মধ্যে দিয়েও ঘাটু গানের মধ্যে দিয়ে নিজেরা যেমন মজা আহরণ করেন, তেমনি অন্যান্য দর্শকদেরকেও বিনোদন প্রদান করে থাকেন। ঘাটু গান সাধারণত কার্ত্তিক মাস থেকে অগ্রহায়ণ-পৌষ মাস পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ঘাটু গানের দর্শকেরাও সাধারণ শ্রেণী পেশার খেটে খাওয়া মানুষ। তারা নিজেদের কাজের অবসর সময়টুকুতে ঘাটু গানের আসরে এসে আনন্দ উপভোগ করে থাকেন (পৃ:৩০৫-৩০৯)।

রহমান ও আহমেদ (২০০৫) বলেন, বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলায় মধ্যযুগের অন্তপর্ব থেকে ঘাটু, ঘেঁটু, গাঁটু বা গাড়ু ইত্যাদি নামের এক জাতীয় সঙ্গীত প্রচলিত — উনিশ শতকের গোড়ায় সামন্ত জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই শিল্পরীতি জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে। সঙ্গীত প্রধান ঘাটু গান সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের অভিমত নিম্নরূপ- ঘাটু অর্থাৎ কোন কিশোর বা বালক নারীর রূপসজ্জা গ্রহণ পূর্বক যখন উক্তি- প্রত্যুক্তির মাধ্যমে নৃত্যগীত পরিবেশন করে তাকে সাধারণ অর্থে ঘাটু গান বলে। ঘাটু সচরাচার দ্বিচরিত্র বিশিষ্ট নাট্য। এতে একজন রাঁধা ও অন্যজন কৃষ্ণবেশী বালক বা পুরুষ থাকে। তবে অন্যান্য ধরনের যৌন উদ্দীপনামূলক গানও ঘাটু গানে পরিবেশিত হতে দেখা যায়। বৃহত্তর ময়মনসিংহের কেন্দুয়া অঞ্চলে নারীবেশী কিশোরের সঙ্গে ধুতিপরা স্বাবাভিকভাবে শ্মশ্রুমণ্ডিত দ্বিতীয় অভিনেতাকেও মঞ্চে অবতীর্ণ হতে দেখা যায়। পূর্বে ঘাটু গানের ঘাটু ছেলেটির রক্ষণাবেক্ষণ করতো গ্রামের বিত্তবান ব্যক্তি। সুন্দর ও লাবণ্যময় নারী সুলভ আচরণের অধিকারী এইসব বালক বা কিশোরদের ক্রয়ও করা হতো। এর সঙ্গে সমকামের বিষয়টিও জড়িত ছিল বলেও শ্রুত হয়। ঘাটু গানের শিক্ষক ময়মনসিংহ অঞ্চলে মৌরাদার, মরাদার (মহড়াদার) নামে পরিচিত। অল্প বয়স থেকে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে নিপুণ ঘাটু (গাড়ু) তৈরি করতে হয়। ঘাটুর চুল মেয়েদের মতো করে লম্বা করে রাখার বিধান এবং তার ঘাটুপনা দাড়ি-মোচ

ভালোভাবে গজানো পর্যন্ত চলতো। কারণ তখন ঘাটুর কণ্ঠস্বরের মধ্যে পুরুষের স্বাভাবিক স্বর এসে যাবার ফলে তার কমনীয়তাও অন্তর্হিত হতো (পৃ: ৪৭-৪৮)।

সরকার (২০১২) বলেন, ঘাট নামকরণ সম্পর্কে স্থানীয়ভাবে আদিকালের সমজদারদের বক্তব্য ছিল — কৃষ্ণের বাঁশির ঘাট শব্দ থেকে ঘাটু নামকরণ হয়। কারণ ঘাটু ছেলেটিকে মূলত নাচে ও গানে নিয়ন্ত্রণ করে বাঁশি। আবার সমজদারদের মধ্যে এক ধরনের তত্ত্বকথাও চালু ছিল। আমার (লেখকের) নিজ গ্রামের ঘাটু গানের সমজদার ফদুর বাপ মিয়ার নিকট শুনেছি অনেক তত্ত্ব কথা। বাঁশির ছয়টি ঘাট হলো ষড়রিপু। ষড়রিপুকে সাধনার বলে জয় করে অর্জন করতে হয় মনুষ্যত্ব। আর বাঁশির ছয়টি ঘাটকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে বেজে ওঠে সুমধুর সুর। এই ছয়টি ঘাট ছাড়াও বাঁশির দুই প্রান্তে থাকে দুটি ছিদ্র এবং একটি ফুঁক দেওয়ার ছিদ্র। এ সবের সমষ্টি হলো রাঁধার অষ্টসখি। মানে বাঁশির ছয়টি ঘাট এবং দুই প্রান্তের দুই ছিদ্র৷ আর ফুঁক দানের ছিদ্রটি স্বয়ং রাঁধা। কৃষ্ণের ফুঁক রাঁধাকে করেছে মধুর এবং জগতের প্রিয়। তাই রাঁধা-কৃষ্ণ ভিত্তিক বাঁশির সুরে নিয়ন্ত্রিত গানকে ঘাটু গান নামকরণের ইতিবিত্ত অযৌক্তিক নয় (পৃ: ২৭)।

সরকার (১৯৮৮) বলেন, ... 'গাড়ু গান' 'গাটু গান' সম্পর্কে তিনি রীতিমত মৌলিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছিলেন৷ তিনি লক্ষ করেছেন যে, গাড় শব্দটির অঞ্চলভেদে উচ্চারণভেদ ঘটেছে। যেমন — গাড়ু, গাঁড়ু, ঘাটু, ঘাঁটু, ঘেটু, গাঁটু ইত্যাদি। পশ্চিমা কুলিদের মুখে শব্দটির উচ্চারণ 'গান্টু'। শব্দটির আঞ্চলিক উচ্চারণভেদ পর্যালোচনা করে তিনি ধারণা করে নিয়েছেন- " এই শব্দের মূল অনুসন্ধান করিলে আমরা দুইটি শব্দ পাই- 'গান' আর 'ঘাট'। গান + টু = গান্টু>গাঁটু, আর ঘাট + উ = ঘাটু"। দুটো শব্দের আনুপূর্বিক আলোচনার শেষে তিনি 'গাটু' শব্দটিকেই গ্রহণীয় বলে বিবেচনা করেছেন। এ ব্যপারে তিনি গোবর্ধন শাস্ত্রী নামক একজন গুজরাটী সন্ন্যাসীর সাক্ষ্য হাজির করেছেন। তার সঙ্গে আলাপ করে কাশিমপুরী জানতে পান:

ক || "গুজরাটের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা সুন্দর বালকদিগকে নাচগান শিখাইয়া মেয়েদের পোশাক ও অলংকার পরাইয়া নৃত্যগীতের সাথে বেশ আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন৷ এই ছেলেদিগকে 'গান্টু' বলা হয়"।

খ || "বৃন্দাবন মথুরা হইতে গঙ্গার তীর ধরিয়া রাজমহল পর্যন্ত নিম্ন শ্রেণীর চাষী ও কুলিদের মধ্যে 'গান্টু' গানের প্রচলন দেখা যায়।

এই সন্ন্যাসীর নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কাশিমপুরী 'গান্টু' গানের সঙ্গে 'গাড়ু' গানের যোগসূত্র খুজে বের করেন। সে সূত্রের যোগসাজশে নির্দ্বিধায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে; গান্টু থেকেই 'গাঁটু' ও 'গাড়ু' শব্দের উৎপত্তি। যারা শব্দটিকে ঘাটু বলতে চান তাদের অভিমতকে তিনি বলিষ্ঠতার সাথে প্রত্যাখান করে দেন। কাশিমপুরী বলেন যে, যাহারা

শব্দটিকে ‘ঘাটু’ বলিতে চাহেন, তাহাদের সঙ্গে নানা কারণে একমত হওয়া চলে না। কারণ হিসেবে বলেন, প্রথমত শ্রাবণী বর্ত আর শারদীয় পূজার আড়ং ব্যতীত এই ছেলের দলকে আর কোনদিন নৌকায় তুলিয়া ‘ঘাটে ঘাটে’ নৃত্যগীতের আসর জমাইতে দেখি নাই। এই দুই দিন ব্যতীত আর সব সময় এ গান লোকালয়েই গীত হইয়াছে। ...দ্বিতীয়ত, কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, কৃষ্ণের যমুনার ঘাটে বিসখা গোপবালাদের সঙ্গে জলকেলি, বস্ত্রহরণ ইত্যাদি লীলা খেলার অবতারণা হইতেই কৃষ্ণের আর এক নাম ‘ঘাটু’ হইয়াছে৷ এ ব্যাখ্যার উদ্ভাবন এক উদ্ভট কল্পনা বলিয়া মনে হয়। বৈষ্ণব সাহিত্যের কোথাও (কৃষ্ণ বিষয়ক অন্যান্য গ্রন্থেও) এরূপ কল্পিত নামের সন্ধান পাওয়া যায় না। কাজেই আমরা বলিতে বাধ্য হইলাম যে শব্দটি ‘ঘাটু’ নহে ‘গাঁটু’ হওয়াই যুক্তিসঙ্গত (পৃ: ৬৫-৬৭)।

তবে এসব আলোচনা থেকে আমরা ঘাটু গানের নামকরণ প্রসঙ্গে যে সিদ্ধান্তেই উপনীত হই না কেন, নেত্রকোনা তথা পূর্ব-ময়মনসিংহ ও বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে ঘাটু শব্দটিকে এখনও গাঁড়ু, গাড়ু ও ঘাটু বলে উচ্চারণ করা হয়। আর উল্লিখিত অঞ্চলগুলি হাওর, বাওড় ও নদীবিধৌত হওয়ায় ঘাটে ঘাটে নৌকা ভিড়িয়ে এ গান পরিবেশন করা হত তাতেও দ্বিমত থাকার কোন কারণ নেই। কারণ তৎকালীন সময়ে ঐ সব অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রধান মাধ্যেম ছিল নৌ পথের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। নামকরণ নিয়ে দ্বিমত থাকলেও ঘাটু গানের উৎপত্তি স্থান ও কাল নিয়ে বিশেষজ্ঞবৃন্দ অনেকাংশেই একমত হতে পেরেছেন।

সরকার (২০১২) বলেন,

> “ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে সিলেট জেলার আজমিরিগঞ্জের অধিবাসী উদয় আচার্য দেব গাঁটু গানের প্রবর্তক; কিন্তু উদয় আচার্য দেবের মৃত্যুর পর এই সাধন পদ্ধতি সম্পূর্ণ বিকৃত হইয়া লোকসাহিত্যে পরিণতি লাভ করিল” (পৃষ্ঠা ২৭)।

উপর্যুক্ত আলোচনার মধ্যে দিয়ে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগে সিলেটের আজমিরিগঞ্জেই ঘাটু গানের উৎপত্তি। বর্তমানে আজমিরিগঞ্জের অবস্থান হবিগঞ্জ জেলায়৷ হবিগঞ্জের ফান্দুক নামক গ্রাম ছিল ঘাটুর জন্য বিখ্যাত৷ এ গ্রামের ঘাটুর খুব কদর ছিল তৎকালীন সময়ে। নেত্রকোনাসহ অন্যান্য অঞ্চলের মানুষজন ফান্দুক গ্রাম থেকেই ঘাটু সংগ্রহ করতো। সরকার (২০০২) বলেন, আমাদের অঞ্চলে সবচেয়ে নামী ঘাটু ছিল ফান্দুক ঘাটু, একে আঞ্চলিকতায় বলা হতো হান্দুইক্যা ঘাটু। ফান্দুক বর্তমান হবিগঞ্জ জেলার আজমিরীগঞ্জ এলাকার একটি গ্রামের নাম বলে জানা যায়। ফান্দুক গ্রামেই ঘাটু বেঁচাকেনা হতো। অপরদিকে সেই ঘাটু ছোকড়াকে যিনি কিনে আনতেন তার কাছ থেকে টাকার বিনিময়ে পত্তন নেওয়া হতো। যিনি ঘাটু ছোকড়াকে পুষতেন তাকে বলা হতো মালিক বা সখীনদার।

সখীনদারই ছিলো [যদৃষ্টং] ঘাটু ছোকড়ার মূলকর্তা বা অভিভাবক। সখীনদারের নেতৃত্বেই দলের নিয়ন্ত্রণ ছিলো। প্রবীণদের কাছে জানা যায় যে, নিজের বিবাহিতা স্ত্রীকে আদর সোহাগ দিয়ে যেভাবে পালন করা হতো, ঠিক ঘাটুর ক্ষেত্রেও এর কোন ব্যতিক্রম ছিলো না। ঘাটু ছোকড়াকে নিয়ে গ্রাম্য দলাদলি, গ্রামে গ্রামে দাঙ্গাহাঙ্গামা খুনখারাবীর ঘটনাও ঘটেছে বলে জানা যায়। বিকেলের অবসর সময়ে সখীনদার ঘাটু ছোকড়াকে নিয়ে গ্রামের হাটে বাজারে যেতো বেড়াতে। তখন সেই ঘাটু ছোকড়াকে মিষ্টি রসগোল্লা খাইয়ে মনতোষণ করার জন্য লোকজনের মাঝে প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হতো, কার দেওয়া মিষ্টি রসগোল্লা খাওয়াবে। যার দেয়া এ দ্রব্য ঘাটু ছোকড়া খেতো সেই ব্যক্তি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করতেন (পৃ: ১০)।

ঘাটু গান নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে হুমায়ূন আহমেদের নির্দেশিত *ঘেটুপুত্র কমলা* তে এর প্রমাণ পাই। মাঠ পর্যায়ে কাজ করার সময় নিবিড় সাক্ষাৎকার গ্রহণের ক্ষেত্রে জানা যায় যে, তৎকালীন সময়ে যাঁরা ঘাটু পালার মত স্বচ্ছল ছিলেন না তারা সখীনদার যে ঘরে ঘাটু ছোকরাকে নিয়ে থাকতেন সেই খাটের সাথে পাটকাঠি স্পর্শ করে মেঝেতে বা অন্য কোথাও শুয়ে থাকতেন। আর এতেই তারা নিজেদেরকে গৌরবান্বিত মনে করতেন।

সরকার (২০১২) বলেন, উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত নেত্রকোনা জেলার প্রায় সবখানেই এ গানের ব্যপক প্রচলন ছিল। বিশেষ করে হাওর অঞ্চল খালিয়াজুরি, মোহনগঞ্জ, মদন, আটপাড়া এবং কেন্দুয়া উপজেলায় এর কদর ছিল সর্বাধিক। এসব উপজেলার অধিকাংশ গ্রামেই ছিল ঘাটু গানের দল। বলা যায়, নদীনালা, হাওর-বাওড়, বিলঝিল বেষ্টিত হাওড় জনপদই ছিল এ গানের শিল্পীদের মূল চারণভূমি। তবে নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ ও বৃহত্তর সিলেট ছাড়াও ত্রিপুরার কিছু এলাকাতেও ঘাটু গানের প্রচলন ছিল বলে বিভিন্ন তথ্যসূত্রে উল্লেখ পাওয়া যায়। নেত্রকোনার জনপদে বিশ শতকের প্রথম দু-দশক পর্যন্তও ঘাটু গান রমরমা ভাবে টিকে ছিল। এর পরবর্তী সময় থেকে তা ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হতে শুরু করে।

ঘাটু গানে ঘাটু মূলত একটি চরিত্র। বলা যায় মূল চরিত্র। যাকে কেন্দ্র করে গানের দল, এবং যে নেচে গেয়ে দর্শকদের মাতোয়ারা করে — তাকেই বলা হয় ঘাটু। কেউ কেউ বলতেন ঘাটু ছোকড়া। বালক বা কিশোর বয়সী ছেলেদের ঘাটু হিসেবে ব্যবহার করা হতো। ঘাটু ছোকড়াদের মাথায় লম্বা চুল রাখা ছিল বাধ্যতামূলক। তারা চুলে বেণি ও খোঁপা বাঁধত। পোশাক ছিল ধূতি ও হাতাকাটা গেঞ্জি। তবে গানের আসরে তারা রং বেরঙের ঘাগড়া পরে উঠত। শেষদিকে তাদের শাড়ি-ব্লাউজ পরতেও দেখা যেত। ঘাটুরা মেয়েদের মত করে অলংকার ব্যবহার করতো। পায়ে ঘুঙ্গুর পরত। তাদের চালচলনে সব সময় থাকতো মেয়েলিপনার প্রকাশ। মেয়েলিস্বভাবের ছেলেরাই এতে প্রাধান্য পেত। এদের যুবতীসুলভ রূপলাবণ্য, সুরেলা কণ্ঠ, পোশাক পরিচ্ছদ, অঙ্গভঙ্গি ও নৃত্যই ছিল দর্শকদের মূল আকর্ষণ (পৃ: ২৭)।

ঘাটু গানের বিষয়বস্তু ও শ্রেণীবিভাগ প্রসঙ্গে রহমান ও আহমেদ (২০০৫) বলেন, ঘাটু গান বা পালা প্রসঙ্গভিত্তিক হলেও এর বিষয় মূলত ইন্দিয়গ্রাহ্য প্রেম। এতে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে গীতিনৃত্যের অবতারণা করা হয় এবং পালার নানা প্রসঙ্গ এগিয়ে চলে। ঘাটু গানের নানা শ্রেণী আছে। (১) প্রকাশ্য ঘাটু গান (২) ছাপা, প্রকাশ্য গানেই যৌন রসের অবতারণা করা হয়, শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে তাই এর চাহিদা অধিক। ছাপা শ্রেণীর ঘাটু গান রাঁধা-কৃষ্ণের প্রেম, কূট ও লোকায়ত দর্শনপুষ্ট ব্যাখ্যা। এ গানে সমজদারের প্রয়োজন, ছাপা গানের অন্যতম ছম বা ছম গান। ছম গানের আবার নানা ভাগ আছে। যথা (১) জল ভরা, (২) রঙ বাউলা, (৩) বিচ্ছেদ বা মুর্শিদী এবং (৪) মুরলী।

তবে জলভরা ঘাটু শ্রেণীর অন্তর্গত হলেও তা দোহার সহযোগে একক নৃত্য গীতের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়। জল ভরা কৃষ্ণ বিষয়ক গান (পৃ: ৪৮)।

ঘাটু গানের তুমুল জনপ্রিয়তার দরুন টাকার বিনিময়ে ঘাটু কেনাবেচা হতো। সরকার (২০১২) বলেন, অন্যান্য এলাকার মতো নেত্রকোনাতেও টাকার বিনিময়ে ঘাটুদের কেনা-বেচার প্রচলন ছিল। এমনকি জমিজমার মতো বন্ধক বা পত্তন দেয়ার প্রথাও চালু ছিল। এ জন্য নাচে-গানে ভাল এবং সুন্দর ঘাটুদের নিয়ে ক্রেতাদের মধ্যে রীতিমত প্রতিযোগিতা হতো। এ নিয়ে মারামারির উদ্ভব হয়েছে কখনও কখনও। হয়েছে বিচার সালিশও। তিনি উল্লেখ করেন, ঘাটু লালন-পালন করা তখনকার সমাজ জীবনে ছিল আভিজাত্যের প্রতীক। সাধারণত প্রাচীন জমিদার, বিত্তবান জোতদার ও সৌখিন ব্যক্তিরাই ঘাটু রাখতেন। ঘাটু গানের দুটি ধারা ছিল। একটি ছিল প্রতিযোগিতামূলক এবং অপরটি ছম গান। প্রতিযোগিতার সময় সমজদাররা আমন্ত্রিত হতেন। গানের বিষয়বস্তু সম্পর্কে যার তত্ত্বজ্ঞান থাকতো তিনিই হতেন খ্যাতিমান সমজদার। সমজদাররা প্রতিযোগিতার রায় দিতেন। প্রতিযোগিতামূলক ঘাটু গানও ছিল দুই ধরনের। যেমন: প্রকাশ্য ঘাটু গান ও চাপা ঘাটু গান। প্রকাশ্য ঘাটু গান ছিল জমজমাট এবং সহজবোধ্য। চাপা গান ছিল কিছুটা কঠিন। অনেকের পক্ষে তা বোঝা ছিল কষ্টসাধ্য। সমজদাররাই তার নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝতেন। কারণ, চাপা গানে অনেকটা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মতো শুধু সুর বা রাগিণী উচ্চারণ করা হতো। শব্দ বলা হতো না। প্রতিযোগিতামূলক ঘাটু গানে এক দল গীত-গানের মাধ্যেমে অন্য দলকে প্রশ্ন করত। বিপক্ষ দল তার উত্তর দিত। অথবা এক দলের গাওয়া গান অন্য দলকে ব্যখ্যা বিশ্লেষণ করতে হতো। এ জাতীয় গানে এক পক্ষ রাঁধা হলে অন্য পক্ষ হতো কৃষ্ণ। গানের কাহিনী বিন্যাসের প্রয়োজনে ঘাটুরাই কখনও কখনও গানের মাঝে সখা-সখির ভূমিকায় রূপান্তরিত হতো। প্রতিযোগিতামূলক ঘাটু গানের কয়েকটি চরণ:

রাঁধার প্রেরিত সখা এসে সুবলকে জানাচ্ছে- ‘দুঃখে-কষ্টে আছেরে শ্যাম তোমার বিধূমুখি/ কাম দশায় পড়িয়াছে মরণ কেবল বাকী ।। / আমারে পাঠাইয়ায় দিল, যাবে কিনা যাবে বল/ উন্মাদিনী হইয়া গেল সত্য যুগের লক্ষ্মী ।।’ ...

এরপর প্রতিপক্ষের ঘাটু কৃষ্ণ রূপে এসে উত্তর দিচ্ছে- ‘আমি যাইতেও পারি না, মনেও তো মানে না / যাব না সুবল আমি রাঁধার খবরে / দেখ সুবল তুমি চিন্তা করে ।। / আমি তার প্রেমের পোড়া, পুড়লাম জনম ভরা / দেখাই প্রেমের ইশারা, রেখ স্মরণ করে ।।...

প্রতিযোগিতার বাইরে ঘাটু গানের যে ধারা প্রচলিত ছিল তার নাম হচ্ছে ছম গান। এই ছম গান অনেকটা বৈঠকী ধাঁচের গান । অনেকের কাছ থেকে জানা যায় যে এই ধারার গনেরই নাকি তৎকালীন সময়ে বেশি জনপ্রিয়তা ছিল । এই ছম জাতীয় ঘাটু গান বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল । যেমন — জলভরা, বিচ্ছেদ, রং-বাউলা, মুরলী ইত্যাদি । রং-বাউলা গানের সাথে বাউল গানের ঘনিষ্ঠতা অনেক নিবিড়; বাউলের দেহতত্ত্বমুলক গানের সঙ্গে ছম রং-বাউলা গানের মিল লক্ষ করা যায়। ঘাটু গানের মূল বিষয়বস্তু ছিল রাঁধা-কৃষ্ণের প্রণয়লীলা । চিরায়ত এই প্রেমলীলাকেই কেন্দ্র করে রচিত হত ঘাটু দলের বিভিন্ন ধরনের গান । আসরে উঠে প্রথমে ঘাটু বন্দনা দিয়ে শুরু করে এবং এর পর গানের ধারা প্রেম, প্রেমতত্ত্ব, মান-অভিমান, বিচ্ছেদ, মিলন ও সন্ন্যাস প্রভৃতি বিষয় অবলম্বন করে প্রবাহিত হতে থাকে। শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমনের পর অথবা তার সান্নিধ্য না পেয়ে রাঁধার বিরহ উপলক্ষ করে রচিত বিচ্ছেদ গানগুলোতে পরিলক্ষিত হতো চিরন্তন বেদনার সুর । অনেকের মতে, ছম ঘাটু গানের রাঁধা-কৃষ্ণের বিরহ সঙ্গীত থেকেই নেত্রকোনার অন্যান্য লোক সঙ্গীতে ‘রাই ধারা’ ও ‘শ্যাম ধারা’র উদ্ভব। এজন্যই নেত্রকোনাকে অনেকেই রাই বিচ্ছেদ গানের এলাকাও বলে থাকেন । রসাত্মক বা ব্যাঙ্গাত্মক কিছু গানও করা হতো ঘাটু গানের আসরে। যেমন- ১ ‘রাঁধার বস্ত্র, কানুর বাঁশি থইয়া নামল জলে / বাঁশি নিল চিকন কালা, বস্ত্র নিল স্রোতে / জল ভর যুবতী কন্যা জলে দিছ মন / কালাচান আসিয়া বস্ত্র করিল হরণ ।।’ ২ ‘বাঁশিটি বাজাইয়া কৃষ্ণ রাখল কদম ডালে / লিলুয়া বাতাসে বাঁশি রাঁধা রাঁধা বলে / অষ্ট আঙ্গুল বাঁশের বাঁশি, মইধ্যে মইধ্যে ছেদা / নাম ধরিয়া ডাকে বাঁশি কলঙ্কিনী রাঁধা ।।

জল ভরা ছম গানগুলোতে ছিল হাওড়-নদী-নালাসহ প্রকৃতির বর্ণনার পাশাপাশি প্রেম-বিরহের ইঙ্গিত। হিন্দু ধর্মের রাঁধা-কৃষ্ণ কাহিনীই ঘাটু গানের মূল প্রতিপাদ্য হলেও এক পর্যায়ে ইসলাম ধর্মের নানা বিষয়সহ নরনারীর সাধারণ প্রেম-বিরহ এবং সমসাময়িক বিষয়বস্তুও উঠে আসে ঘাটু গানে। এর অবশ্য যুক্তিযুক্ত কারণও আছে। কারণ, হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের লোকজনই ছিল ঘাটু গানের দর্শক-শ্রোতা (পৃ: ২৭) ।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে আমরা ইংল্যান্ডে Servant Actor বা বালক অভিনেতার উপস্থিতি দেখতে পাই । ঘাটুকে আমরা পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের ইংল্যান্ডের বালক অভিনেতাদের সাথে তুলনা করতে পারি । এ প্রসঙ্গে ব্রোকেট (১৯৭৪) বলেন,

> Although there were wandering players in England by the fifteenth century, actors (if they had no other profession) were, according to the laws of the time, vagrants and rogues. Those troupes attached to the households of nobles were exempted from this category, however, because they were classified as servants rather than actors. (p: 160-161)

অপরদিকে আমরা জানতে পারি যে, আমাদের বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম ছোট বেলাতে ঘাটু গানের মতোই প্রচলিত লেটো গানের দলের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন। লেটোর দলে কিশোরদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত ছিল। লেটো গানের পরিবেশনায় ঘাটু গানের মতই ছোট ছোট প্রেমগীত, ডুয়েট, রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গান এবং এর পাশাপাশি ইসলামী গানসহ চাপান, উতোর, সং ও বিভিন্ন পালা থাকতো। লেটো গানে কিশোরেরা মেয়ে সেজে নাচ করতো। আর তাদেরকে বলা হত বাই, ছোকরা ও রাঢ়। যেখানে তিনি অভিনয়ে অংশগ্রহণ করতেন ও দলের জন্য বিভিন্ন ধরনের গান ও পালা রচনা করতেন। নজরুলের লেটো গানের সাথে সম্পৃক্ততা সম্পর্কে ভুঁইয়া (১৯৭৭) বলেন,

> "১৩১৭ সালে তিনি যোগ দেন লেটোর দলে। চুরুলিয়া গ্রামের আশেপাশে কয়েকটা লেটোর দল ছিল। নজরুল তাদের জন্য পালাগানও লিখে দিতে আরম্ভ করেন" (পৃ: ১৪)।

২.২ ঘাটু গানে শিল্পীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান

"Beauty is truth, truth is beauty,
That is all you know on earth, and
You need to know."— John Keats

ইংরেজ কবির এই বিখ্যাত উক্তি আমাদের সবারই জানা। মানুষ তার সৌন্দর্য সাধনের জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করে থাকেন। ১০ম শতাব্দীতে চায়নাতে আমরা দেখতে পাই যে, নারীর সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য পাবন্ধনীর প্রথা প্রচলিত ছিল। চার থেকে ছয় বছর বয়েসি সময় থেকেই কন্যা শিশুদের মাঝে পাবন্ধনীর পদ্ধতি শুরু হয়ে যেত। যা ছিল যুবতী মেয়েদের জন্য খুব কষ্টের ও যন্ত্রণার বিষয়। অনেক সময় দীর্ঘ দিন শক্তভাবে পা বেঁধে রাখার ফলে সংক্রমণ ঘটে শরীর থেকে পা শুকিয়ে যেত এবং মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়তো। তখনকার সমাজব্যবস্থায় কোনো লোক পা বন্ধনী বিহীন কোনো নারীকে বিয়ে করতো না। এটি ছিল মূলত চাইনিজদের জন্য সৌন্দর্যের হাতিয়ার। তাই তৎকালীন সমাজব্যবস্থার আলোকে নারীকে তার সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য জীবনের বিনিময়ে খেসারত দিতে হতো।

চিত্র ৩ : চাইনিজ ফুট বাইন্ডিং। ছবি: সংগৃহীত

চাইনিজ নাটকে আমরা যে নারীকে দেখতে পাই সেখানেও চরিত্রের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে ফুট বাইন্ডিং এর প্রসঙ্গ উঠে আসে। নাটকে ফুট বাইন্ডিং প্রসঙ্গে Qian (as cited in Tian, 2000) বলেন,

"JING: You are a fake women.

DAN: I am a real women.

JING: As a women, then, why did you not bind your feet?

MO: You should look upwards"(p: 80).

অপরদিকে থাইল্যান্ডেও আমরা দেখতে পাই যে নারীদের সৌন্দর্য অনেকটা নির্ভর করে তার গলার উপর। যে নারীর গলা যত বেশি বড় সে নারী তত বেশি সৌন্দর্যের আঁধার হয়ে ওঠেন পুরুষের কাছে। তাই ছোটবেলা থেকেই থাই নারীরা তাদের কন্যা সন্তানদের গলায় ধাতব পদার্থ দিয়ে বেড়ি দিয়ে রাখেন এবং এ অবস্থাতেই তারা স্বাভাবিক কাজ কর্ম চালিয়ে যান। দীর্ঘ দিন পর ঐ বন্ধনী খোলা হলে তার গালাটা লম্বা দেখায়। আর এটাই থাই নারীদের জন্য সৌন্দর্যের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে।

চিত্র-৪ : নেক বাইন্ডিং ইন থাইল্যান্ড। ছবি: সংগৃহীত

আমাদের দেশের নারীরাও তাদের সৌন্দর্যের হাতিয়ার হিসেবে অনেক অলংকার ও বেশভুষার আশ্রয় নিয়ে থাকেন কিন্তু এ রকম করে ত্যাগ স্বীকার করেন না। কিন্তু পুরুষকে আকৃষ্ট করার জন্য বাঙালি রমণীরা তাদের বিভিন্ন অঙ্গসমূহ যা তাদের সৌন্দর্যের বিকাশ ঘটায় সেগুলোকে বিভিন্নভাবে অলংকৃত করে উপস্থাপন করে। বাঙালি রমণীর সৌন্দর্যচর্চা প্রসঙ্গে জলিল (১৯৯৩) বলেন, ঐশ্বর্যশালী পরিবারের ললনাদের প্রতিটি অঙ্গেই কোনো না- কোনো প্রকারের অলংকার থাকতোই। কর্নালংকারের মধ্যে কর্ণফুল বা কনকপাতি, কুণ্ডল, করী, ধেড়ি, পাশা, ঝুমকা ও তারক ব্যবহার করতো। নাকের

অলংকারের মধ্যে তারা নথ, বেউলি, বেসর, নোলক ও নাকমাছি নামক বিভিন্ন ধরনের অলংকার ব্যবহার করতো। বাহুতে সাধারণত পরিধান করতো বাহুটি, বাজু, তাড়, ডাঙ ও তোড়ল। এর পাশাপাশি আঙ্গুলে বিভিন্ন ধরনের অঙ্গুরি ও পায়ের সৌন্দর্য বিধানের জন্য নূপুর, পাশুলি, মল বা পাটামল, পায়জের, আরবেকী, আঙ্গুটি, ছনলুয়া ব্যবহৃত হত। সেকালের রমণীরা মাথার কেশকে নারী সৌন্দর্যের অমূল্য ভূষণ হিসেবে মনে করতো। আর খোপায় গুঁজে দিত সোনার কাঁটা, পরিয়ে দিত যূথী, চম্পক, চামেলী, মালতী, বকুল ও হরেক রকম পুষ্প কিংবা পুষ্পমাল্য। পা রাঙ্গা করবার জন্য আলতা পড়তো অনেকেই (পৃ: ৭৫-৭৯)।

উপরে আলোচ্য অলংকার পরিধানের প্রথা এখনও আমাদের বাঙালি সমাজে রয়েছে। বরং অলংকারের ব্যবহারে আরও অধিক পরিমাণে বৈচিত্র্য এসেছে। আমাদের বাঙালি সমাজের নারীরা বিভিন্ন অলংকার ব্যবহারের পাশাপাশি তাদের হৃদয়ের কোমলতা দিয়ে পুরুষের মন জয় করার চেষ্টা করে থাকেন। যার মধ্যে দিয়ে তারা পারিবারিক জীবনে শান্তি বজায় রাখেন। এ প্রসঙ্গে জলিল (১৯৯৩) বলেন,

অধিকাংশ বাঙালি নারীজীবনের প্রধান কাম্য পতিপ্রেমে বিজয়িনী হওয়া। কাঞ্চন-কান্তিই সৌন্দর্য নির্ণয়ের একমাত্র মাপকাঠি নয়। মাথার কেশগুচ্ছ থেকে শুরু করে ললাট, নেত্র, ভুরু, কপোল, চিবুক, ওষ্ঠ, বক্ষ, নিতম্ব এমনকি পদনখ – এসবকিছুর সমন্বয়েই নির্ণীত হয় প্রকৃত সৌন্দর্য। তিনি বলেন, রমণীর সৌন্দর্য নির্ভর করে মূলত দুটি বিষয়ের উপর যথা একটি জন্মলব্ধ, অপরটি সাধনালব্ধ। তবে আমারা দেখতে পাই যে জন্মলব্ধ সুন্দরী রমণীদের চেয়ে সাধনালব্ধ সুন্দরী রমণীরাই বিবাহিত জীবনে অধিকতর সুখী জীবন-যাপন করে থাকেন। কারণ এরা দেহের বহিরঙ্গ সৌন্দর্যের ঘাটতি অন্তরের কমনীয় স্বভাব চরিত্রের দ্বারা পূরণ করার চেষ্টা করে থাকেন। যা কিনা সৌন্দর্যময়ী রমণীদের নিকট পুরুষেরা কম পেয়ে থাকেন। আবার এর ব্যতিক্রমও পরিলক্ষিত হয়, কেননা বাঙালি সমাজে এমনও অনেক সুন্দরী নারী রয়েছেন যারা দৈহিক সৌন্দর্যের সঙ্গে অন্তরের মাধুর্য দিয়ে দাম্পত্য জীবনে স্বর্গীয় অমীয় ধারা সৃষ্টি করে থাকেন। বাঙালি নারী-মানসের বিশেষত্বের এটি একটি উল্লেখযোগ্য দিক (পৃ: ৭৩)।

ঘাটু গানের মধ্যে দিয়েও আমরা দেখতে পাই যে নারী দেহের বহিরঙ্গ সৌন্দর্যের প্রতি অধিকতর গুরত্ব প্রদান করা হয়। ঘাটু ছোকরা নারীকে উপস্থাপনের জন্য মাথার চুল বড় রাখে এবং অনেকাংশে বিভিন্ন অলংকার পরিধান করার জন্য কান ছিদ্র রাখে। মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে গিয়ে এ রকম একজন ঘাটু শিল্পী আনারকলিকে (ছদ্ম নাম) পাওয়া যায় যিনি এ গান পরিবেশন করার জন্য কানে ছিদ্র করেছেন। এ গানের মধ্যে দিয়ে যে নারীদের উপস্থাপন করা হয় তারা বিভিন্নভাবে সমাজ দ্বারা বঞ্চিত।

অপেক্ষাকৃত কম সুন্দরী রমণীদের ক্ষেত্রে এই বঞ্চনা আরও বেশি ঘটে থাকে। আর এই বঞ্চনার মুকাবেলা করতে গিয়ে তাদেরকে যথাযথ শিক্ষার মধ্যে দিয়ে জ্ঞান অর্জন করে পুরুষশাসিত সমাজের আনুকূল্য পেতে হয়। যথাযথ শিক্ষার অভাবেই রমণীরা আজ পর্যন্তও ভোগ্যপণ্য হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। নারীশিক্ষার অভাব ও পশ্চাৎপদতার দরুন তাঁরা জননী, জায়া, কন্যা হয়েও সামাজিক জীবনে পুরুষের সমঅধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে জলিল (১৯৯৩) বলেন,

> শিক্ষা শুধু নারীকে স্বাবলম্বী হতেই সহায়তা করে না ; স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা অর্জনেও সক্রিয় করে তোলে।...পুরুষের মানস-চেতনা সন্ধান করতে একজন শিক্ষিতা রমণীর পক্ষে যত সহজ, একজন অশিক্ষিত রমণীর পক্ষে ততটা নয়। তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, বাঙালি সমাজের পুরুষদের সহজাত প্রবৃত্তিটি যে কি তার স্বরূপ সম্পর্কে কিন্তু বাঙালি নারী মাত্রই জ্ঞাত৷ আর জ্ঞাত বলেই পারিবারিক ঐতিহ্য সূত্রে জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধি দিয়েই পুরুষের দৈহিক ও মানসিক ক্ষুধা নিবৃত্তিকরণের ক্ষেত্রে বহুলাংশে সফল। (পৃ: ৭৩-৭৪)

আর ঠিক এর প্রতিফলনই আমরা দেখতে পাই ঘাটু গানে উপস্থাপিত নারীর মধ্যে। কারণ এ গানে যে নারীকে উপস্থাপন করা হয় সে নারী শিক্ষিত না হলেও পুরুষদেরকে বিভিন্নভাবে নাজেহাল করতে পারদর্শী। আর এ ক্ষমতা তাঁরা পারিবারিক ঐতিহ্যসূত্রেই পেয়ে থাকেন। বিভিন্নভাবে নাজেহাল করতে পারলেও পিতৃতন্ত্রের আলোকে মূল কর্তার ভূমিকায় পুরুষেরাই অবস্থান করেন। এ প্রসঙ্গে আজাদ (২০০১) বলেন,

> মানবজাতি হচ্ছে পুরুষ এবং পুরুষেরা নারীকে নারী হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে না, করে পুরুষের সাথে তুলনা ক'রে; নারীকে গণ্য করা হয় না কোনো স্বায়ত্তশাশিত সত্তা রূপে। ...'নারীর শরীরের থেকে বিছিন্ন থেকেও পুরুষের শরীর নিজেই অর্থ প্রকাশ করে, অন্যদিকে নারীর শরীর একলা নিজে তাৎপর্যহীন... পুরুষ নারীকে বাদ দিয়েও ভাবতে পারে নিজের কথা। নারী পুরুষ ছাড়া নিজের সম্পর্কে ভাবতে পারে না।' নারী তা-ই, পুরুষ যা ঘোষণা করে; এজন্যই তাকে বলা হয় শুধু লিঙ্গ, যা দিয়ে বোঝান হয় যে নারী পুরুষের কাছে শুধুই একটি লৈঙ্গিক প্রাণী। ...নারী হচ্ছে আকস্মিক, অপ্রয়োজনীয়, যেখানে পুরুষ প্রয়োজনীয়। পুরুষ হচ্ছে কর্তা, পুরুষ হচ্ছে পরম- নারী হচ্ছে অপর। (পৃ: ১৯)

ঘাটু গানের মধ্যে দিয়ে আমরা যে নারীর উপস্থিতি পাই সে নারীকেও পুরুষের কাছে আধিপত্য স্বীকার করে বেঁচে থাকতে হয়। এ কারণেই মাঠ পর্যায়ে কাজের সময় দেখি ঘাটু গানে রাধা কৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করে গেয়ে ওঠে —

পুরুষও বেঈমানের জাতগো

আইবার চাইয়া আইলো না.....।

ঘাটু গানের বিভিন্ন অংশে আমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পাই যে নারীকে প্রতিনিধিত্বকারী রাধা তার জীবনের সার্থকতা খোঁজেন পুরুষকে প্রতিনিধিত্বকারী কৃষ্ণের উপর ভিত্তি করে। ঘাটু গানে আমরা যে নারী পুরুষের উপস্থিতি দেখতে পাই তা অনেকটা দাস ও প্রভুর মধ্যেকার সম্পর্কের মতো। যেখানে কৃষ্ণ পালন করে প্রভুর ভূমিকা এবং রাধা পালন করে দাসের ভূমিকা। এ প্রসঙ্গে আজাদ (২০০১) বলেন,

> প্রভু ও দাসের সম্পর্ক সংজ্ঞায়িত করার জন্য যেসব যুক্তি দিয়েছেন হেগেল, সেগুলো বেশি ভাল ভাবে কাজ করে পুরুষ ও নারীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে।...পুরুষ সৃষ্টি করেছে নারীর জন্য এক এলাকা — জীবনের রাজ্য, সীমাবদ্ধতার রাজ্য – নারীকে সেখানে বন্দী করে রাখার জন্যে। (পৃ: ৭১)

উপর্যুক্ত অবস্থার উপস্থিতি আমরা ঘাটু গানের মধ্যে দেখতে পাই। পুরুষই নারীর মূল সত্তার পরিচয়দানকারী। পুরুষই নির্ধারণ করে দেয় যে সমাজে নারীর অবস্থান ও ভূমিকা কি হবে। এ প্রসঙ্গে আজাদ (২০০১) বলেন,

> নারীর উর্বরতাশক্তি সত্ত্বেও পুরুষই থেকেছে নারীর প্রভু, যেমন পুরুষই মালিক উর্বর ভূমির; যার ঐন্দ্রজালিক উর্বরতার সে প্রতিমূর্তি, সে প্রকৃতির মত পুরুষের অধীনে, অধিকারে, শোষণের মধ্যে থাকাই নারীর নিয়তি। পুরুষের কাছে সে পায় যে- মর্যাদা, তা তাকে দিয়েছে পুরুষই; ...এ কারণে সেগুলোকে ধ্বংস করার শক্তিও সব সময় রয়েছে তার আয়ত্তে। (পৃ: ৭৮)

২.৩ ঘাটু গানের মধ্যে দিয়ে সমাজে নারীর প্রতিরূপায়ণ

আমাদের সমাজে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নারীচরিত্র উপস্থাপিত হয় পুরুষের চিন্তা-চেতনা, আচার- আচরণ ও সর্বোপরি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে। পুরুষেরা তাঁদের চিন্তার জগত ও বাস্তব জগতকে যেভাবে নিজেদের খেয়াল খুশিমত করে গড়ে তোলে ঠিক তেমনি তাঁদের নিজেদের ইচ্ছের পুতুলের মত করেই নারীদেরকে উপস্থাপন করতে চায়। আর এ কারণেই আমাদের প্রাত্যহিক সামাজিক জীবনে নারীরা যেভাবে পিতৃতন্ত্রের জাঁতাকলে প্রতিনিয়ত নিষ্পেষিত হচ্ছে ঠিক তেমনি সাহিত্যের জগতেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। অর্থাৎ আমাদের বিভিন্ন ধরনের সাহিত্যের পাতায়ও নারীদেরকে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে পিতৃতন্ত্রের সুস্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় যদিও আমরা নারী লেখকদের অনেকের পরিচয় পেয়ে থাকি তথাপিও নারী লেখকদের সংখ্যা বাড়ানোর পাশাপাশি পুরুষ লেখকদেরও নারীর দৃষ্টিতে নারী চরিত্র চিত্রণের দিকে খেয়াল রাখা উচিত। আমাদের দেশে হিন্দু প্রধান সমাজের স্মৃতিশাস্ত্রে নারী-পুরুষের ভেদাভেদের বিষয়টি সামনে চলে আসে। আমরা একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখতে পাই যে, বাংলা সাহিত্যে আদর্শ নারী হিসেবে সীতার পাশাপাশি সীতার বিপরীত রাধা চরিত্রও প্রাধান্য পেয়েছে। আর এ ভাবেই বিভিন্ন তত্ত্ব লোকমুখে প্রচলিত হবার পর সময়ের পরিক্রমায় তা সাহিত্যে স্থান পায়। বিভিন্ন মাত্রা সংযোজিত হওয়ার পরও আমাদের বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা দেখতে পাই যে সমাজে নারীরা বিভিন্ন ভাবে লাঞ্চনা ও গঞ্জনার স্বীকার৷ এ প্রসঙ্গে আনিসুজ্জামান (২০১৩) বলেন,

> পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে বেশির ভাগ নারী চরিত্রগুলো উপস্থাপন করা হয়৷ নারী লেখক নারীর দৃষ্টিতে লিখলে সাহিত্যে নারীকে অন্যভাবে পাওয়া যাবে। এতে সাহিত্যের অসম্পূর্ণতা দূর হবে। নারী সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হবে।...নারী লেখকদের লেখায় সমাজের নিয়ম ভাঙার ব্যপার থাকে। এভাবে সমাজ সংশোধিত হয়। তবে নারী যদি পুরুষতান্ত্রিকতার আদর্শে লেখেন তাহলে সে উদ্দেশ্য পূরণ হবে না। (পৃ: ৭)

ঘাটুতে যে নারীকে উপস্থাপন করা হয় তা পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকেই উপস্থাপন করা হয়। ঘাটু গানে রাধার মধ্যে দিয়ে যে নারী চরিত্রের রূপায়ণ সাধিত হয় তার রূপ এখানে স্পষ্ট নয়। অর্থাৎ রাধা ও কৃষ্ণের গানের মধ্যে দিয়ে আলাপচারিতায় যে নারীকে সমাজের সামনে উপস্থাপন করা হয় তার স্বরূপ উপস্থাপনে আমরা ব্যর্থ। এই গানে রাধা কৃষ্ণের উপস্থাপন বৈষ্ণব শাস্ত্রে উল্লেখিত রাধা-কৃষ্ণের সম্পূর্ণ বিপরীত। ঘাটু গানে আলোচ্য রাধা-কৃষ্ণের মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের

ব্যক্তিগত জীবনের গল্পের প্রতিরূপায়ণ দেখতে পাই। যেখানে নারীরা অনেকটা নির্দ্বিধায় মেনে নেয় পুরুষের আধিপত্য। এ প্রসঙ্গে আজাদ (২০০১) বলেন,

> নারী নিজেই মেনে নেয় যে সার্বিকভাবে বিশ্বটি পুরুষেরই; যারা এটিকে রূপায়িত করেছে, শাসন করেছে, এবং আজো এটির ওপর আধিপত্য করছে পুরুষ।...প্রতিদিন রান্নাঘরটি তাকে শেখায় ধৈর্য ও অক্রিয়তা; এখানে আছে রসায়ন; মেনে চলতে হয় আগুণকে, জলকে, অপেক্ষা করতে হয় চিনি গলার জন্য, দলা ময়দার তাল ফুলে ওঠার জন্যে।...নারীরা ধ্বংস করা ও নতুন করে তৈরি করার বদলে সব সময়ই চেষ্টা করে সংরক্ষণ করার, খাপ খাওয়ানোর, বিন্যাস করার; বিপ্লবের থেকে তারা বেশি পছন্দ করে আপোষমীমাংসা ও খাপ খাওয়ানোর। (পৃ: ৩২৮-৩৩০)

ঘাটু গানেও আমরা নারীকে অনেকটা অক্রিয় ও পুরুষের উপর নির্ভরশীল হিসেবেই দেখতে পাই। ঘাটু গানের মধ্যে আমরা রাধা-কৃষ্ণের বিরহের মধ্যে দিয়ে মূলত বাঙালি সমাজের সাধারণ নারীদের বিরহের প্রতিমূর্তি দেখতে পাই। এখন পর্যন্ত আমাদের সমাজে নারীরা পুরুষকে তাদের জীবনের সুভ্রতা ও পবিত্রতার প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন। আমাদের বাঙালি সমাজে প্রচলিত সন্ধ্যাপ্রদীপ ও রাধার কৃষ্ণবিরহ প্রসঙ্গে কবির (২০০৯) বলেন, রাধার কাছে তাঁর কৃষ্ণ প্রদীপের মতই শুভ্র। যতদিন কৃষ্ণ বৃন্দাবনে ছিলেন ততদিন রাধা তাদের মিলনস্থলে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালাননি। ছেড়ে যাবার পর থেকেই কৃষ্ণকে স্মরণ করে রাধা প্রতিদিন সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালাতেন। তাঁর জীবন থেকে যে প্রদীপ নিভে গেছে তা আর ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়। তাই কৃষ্ণের প্রতীক হিসেবে বাকী জীবনের প্রতি সন্ধ্যায় বৃন্দাবনে প্রদীপের মাধ্যেমে আলো জ্বালিয়েছেন। বাঙালি সমাজেও সন্ধ্যা হলে ঘরে প্রদীপ জ্বালানোর যে রীতি তা এখান থেকে এসেছে বলে অনেকে মনে করেন। রাধার দুঃখের সাথে একীভূত হয়ে বাঙালি প্রাণও কেঁদে চলেছে প্রবহমান নদীর মত। রাধা চেয়েছেন তাঁর মনের জ্বালা সন্ধ্যাপ্রদীপের আলোয় মিশে দিগন্তে ছড়িয়ে যাক। জ্বালাকে ভালবাসায় রূপান্তরিত করার এই যে বাঙালি রীতি তা এদেশের লোকসাহিত্যের ঐতিহ্যের ধারক ও সাহিত্যিকদের খোরাক জুগিয়ে চলছে (পৃ: ৩১)।

রাধার মত করে সহস্র বাঙালিও সন্ধ্যাপ্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যে দিয়ে তাদের প্রিয়জনের শুভ্রতা অনুভব করে থাকেন।

২.৪ হুমায়ূন আহমেদের ঘেটুপুত্র কমলা ও তৎকালীন আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা

হুমায়ূন আহমেদ তার ঘেটুপুত্র কমলার মধ্যে দিয়ে তৎকালীন সমাজে ঘাটু গানের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটকে তুলে ধরেছেন। এর মধ্যে দিয়ে তিনি এ গানের সাথে সমাজের বিভিন্ন স্তরের তথা উঁচু ও সাধারণ জনতার সম্পৃক্ততার ইতিহাস রচনা করেছেন। ঘেটুপুত্র কমলার মধ্যে দিয়ে আমরা একদিকে যেমন দেখতে পাই ঘেটু পুত্রের আত্মপরিচয়ের সংকট তেমনি দেখতে পাই সামাজিক আধিপত্য ও পতিপত্তির আড়ালে বিনোদনের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা।

ঘেটুপুত্র কমলার বিষয়বস্তু এবং কাহিনী সংক্ষেপঃ "প্রায় দেড়শ বছর আগে হবিগঞ্জ জেলার জলসুখা গ্রামের এক বৈষ্ণব আখড়ায় ঘেটুগান নামে নতুন সঙ্গীতধারা সৃষ্টি হয়েছিল। মেয়ের পোশাক পরে কিছু রূপবান কিশোর নাচগান করত। এদের নামই ঘেটু। গান হতো প্রচলিত সুরে, কিন্তু সেখানে উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের প্রভাব ছিল স্পষ্ট। অতি জনপ্রিয় এই সঙ্গীতধারায় নারী বেশধারী কিশোরদের উপস্থিতির কারণেই এর মধ্যে অশ্লীলতা ঢুকে পড়ে। বিত্তবানরা এইসব কিশোরকে যৌনসঙ্গী হিসেবে পাবার জন্যে লালায়িত হতে শুরু করে। একসময় সামাজিকভাবে বিষয়টা স্বীকৃতি পেয়ে যায়। হাওর অঞ্চলের শৌখিন মানুষ জলবন্দি সময়টায় কিছুদিনের জন্যে হলেও ঘেটুপুত্র নিজের কাছে রাখবেন এই বিষয়টা স্বাভাবিকভাবে বিবেচিত হতে থাকে। শৌখিনদার মানুষের স্ত্রীরা ঘেটুপুত্রকে দেখতেন সতীন হিসেবে।"

হুমায়ূন আহমেদের ছবিটিতে আমরা দেখতে পাই, জমিদারের কন্যা যখন ঘেটুপুত্রকে জানলা দিয়ে বিস্মিত হয়ে দেখে নারী বেশধারী কমলা তার পরচুলা, ওড়না খুলে ফেলছে তখন সে তার মা, চিত্র শিল্পী ও দাসীকে প্রশ্ন করে যে – কমলা ছেলে নাকি মেয়ে ! ছোট্ট জমিদার কন্যার পাশাপাশি আমাদের দর্শকদের মনেও এই প্রশ্নের উদ্রেক করে যে, দরিদ্রতার কষাঘাতে নিজ পরিচয়ের আড়ালে ছদ্মবেশী এই ঘেটুপুত্রের পরিচয় আসলে কি ! ছেলে নাকি মেয়ে ? ঘেটুপুত্র জমিদার বাড়িতে আসার পর থেকেই জমিদারের স্ত্রী ঘেটুপুত্রের সাথে একই বাড়িতে থাকতে অস্বীকৃতি জানায় এবং বাপের বাড়ি চলে যেতে চায়। এসময় দেখা যায় যে জমিদার বলেন, "মাইয়া মানুষ কইতরের মতো, দানা ছিটাইলে চলে আসে।" তিনি মওলানা সাহেবকে ডাক দিয়ে একেবারে তালাক দিয়ে তার স্ত্রীকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে সম্মত হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে জমিদারের স্ত্রী চুপ হয়ে জমিদারের বাড়িতে থাকতেই রাজি হন। এর মধ্যে দিয়ে আমরা তৎকালীন সমাজে নারীর পরাধীনতার চিত্র সুস্পষ্ট ভাবে দেখতে পাই। ঘটনাপরিক্রমায় আমরা এও দেখতে পাই যে, ঘেঁটু পুত্রের সাঁজ নিয়ে জমিদারের আপত্তি থাকায় ঘেটুপুত্রকে সাজিয়ে দেবার দায়িত্ব পড়ে জমিদারের স্ত্রীর উপর। অসহায় জমিদার স্ত্রী কান্নাভেজা চোখে কমলাকে সাজিয়ে দেয় এবং হৃদয়ে জমানো ক্ষোভের আলোকে সাজানোর পর ঘেটুপুত্রের মুখে থুথু ছুড়ে দেয়। এর মধ্যে দিয়ে তৎকালীন সমাজব্যবস্থার আলোকে ঘেটুপুত্র ও নারীর মনস্তাত্ত্বিক বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়। পরিচালক ঘেটুপুত্র

কমলার মধ্যে দিয়ে অত্যন্ত ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও কম সময়ের মধ্যে সফলতার সাথে ঘেটুপুত্রের ইতিহাস তথা ঘাটু গানের ইতিবিত্ত তুলে ধরেছেন। যার ধারাবাহিকতায় আমরা দেখতে পাই সমাজের বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কাঠামো ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সূক্ষ্মতম বলিষ্ঠ অবস্থান। এর আলোকে আমরা শিক্ষকের মুখে জমিদার কন্যার দুধ ছুড়ে মারা ও ঘেটুপুত্রকে সাজিয়ে দেবার পর জমিদারের স্ত্রীর ঘেটুপুত্রের মুখে থুথু নিক্ষেপ করার দৃশ্যের কথা উল্লেখ করতে পারি। অপরদিকে ঘেটুপুত্রকে সাজানো দেখে জমিদার কন্যা তার মায়ের কাছে সাজতে চাইলে জমিদারের স্ত্রী কন্যার মুখে কালি লেপন করে দিয়ে বলেন — এটাই মেয়ে মানুষের আসল সাজ। এর মধ্যে দিয়ে আমরা তৎকালীন সমাজে মেয়েদের আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আসল চিত্র দেখতে পাই।

হুমায়ূন আহমেদ তার চলচ্চিত্রের মধ্যে দিয়ে তৎকালীন সমাজজীবনের অনেক সত্য তথ্য অত্যন্ত হাস্যরসের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছেন। ঘেটু গানের দলের প্রতি আপ্যায়নের মধ্যে দিয়ে তিনি ধর্ম বৈষম্যের পাশাপাশি ধর্মের মেলবন্ধনকেও অত্যন্ত চমৎকার ভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি সমকাম ও শিশু যৌন নির্যাতনের মত দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপটের আলোকে তুলে ধরেন। তৎকালীন প্রেক্ষাপটের আলোকে আমরা বর্তমান সমাজব্যবস্থার দিকে তাকালেও বিকৃত শিশু যৌন নির্যাতনের দৃশ্য দেখতে পাই। কিন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্যাতিত শিশু লজ্জায় বা ভয়ে প্রতিবাদ করতে পারেনা। প্রতিনিয়ত এই অসুস্থতার মাত্রা যেন বেড়েই চলেছে। অথচ এর বিরুদ্ধে তেমন কোন কার্যকর পদক্ষেপ আমরা দেখতে পাই না। চলচ্চিত্রটির শেষ অংশে ঘেটুপুত্রের মৃত্যুর পর আগামী বছর আবার আরেক ঘেটুপুত্র আসবে এমন ইঙ্গিত দিয়ে জমিদার তার স্ত্রীকে মিলনের উদ্দেশ্যে কাছে টেনে নেয়। অপরদিকে জমিদার কন্যা ছোট্ট ফুলরানী একাকী প্রদীপ হাতে কমলার কামরায় প্রবেশ করে তার ফেলে যাওয়া নাচের ঘুঙ্গুর এবং কমলার পোট্রেটের দিকে অশ্রুসজল চোখে তাকিয়ে রয়। ঘেটুপুত্র কমলা চলচ্চিত্রে হুমায়ূন আহমেদ তার নিজস্ব সাবলীল ঢঙ্গে প্রায় দেড়শ বছর আগের অজানা মানবিক এই ঘেঁটুপুত্রের গল্প আমাদের সামনে হাজির করেছেন যার শেষ — "শুয়া উড়িল, উড়িল জীবেরও জীবন" এই গানের সাথে সাথে দর্শক শ্রোতাদের চোখ জলে ভরে উঠে। চোখ জলে ভরে উঠে ঘেটুপুত্রের জন্য, চোখ জলে ভরে উঠে ঘেটুপুত্রের বাবা ও তার পরিবারের জন্য।

বৈচিত্রহীন জীবনের একঘেয়েমী, মাঠের সুর এবং ঘাটের ব্যাঞ্জনা আর সেই সাথে প্রকৃতির উপর নির্ভরতার চিত্রের আলোকে ঘাটু গান এর উৎপত্তি ও প্রাসারতা লক্ষ করা যায়। ঘাটু গানের সাথে যারা যুক্ত হন (বিশেষ করে এ গানের কলাকুশলীবৃন্দ), তারা প্রাকৃতিক ও আর্থ-সামাজিক কারণে জীবিকা নির্বাহের তাগিদে যুক্ত হতে বাধ্য হন। এখানে আমরা

স্বভাবতই দুটি শ্রেণী দেখতে পাই। প্রথমত ধনিক, জমিদার বা জোতদার শ্রেণী এবং দ্বিতীয়ত শ্রমজীবী বা মেহনতী মানুষ যারা অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে জীবন সংগ্রামে লিপ্ত হন। এ প্রসঙ্গে ইসলাম (১৯৬৭) বলেন,

> ... এর পাশাপাশি সৃষ্টি হল জমিদার, মহাজন, শ্রেষ্ঠ এবং উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণী, যাদের হাতে রইল সমগ্র সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো নিয়ন্ত্রণের যাবতীয় কলাকৌশল। দেশের বৃহত্তর জনশক্তি অর্থাৎ কৃষক ও মেহনতী মানুষ, যাঁদের শ্রম নিয়ন্ত্রণ করে উৎপাদনের সকল উৎসকে, তাঁদের অর্থ ও করুণার বিনিময়ে উৎপাদন কর্মে লিপ্ত ছাড়া কোন গত্যন্তর রইল না। (পৃ:৪১৬)

ঠিক যেন এর পুনঃরাবৃত্তির ইঙ্গিত রেখেই চলচ্চিত্রটির ইতি টানা হয়। অপরদিকে ঘেটুপুত্রকে অনেক দিন না দেখতে পেয়ে ব্যকূল হয়ে (কমলার) মা যখন কমলাকে দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে জমিদারের বাড়িতে ছুটে আসে তখন কমলার বাবা ঘেটু গানের দলের কর্ণধার (সর্দার) তার স্ত্রীকে ছেলের সাথে দেখা না করিয়ে গালমন্দ করে হাতে উপার্জিত অর্থের কয়েন গুজে দেয় এবং তাকে ফিরে যেতে বাধ্য করে। উক্ত অর্থ নিয়ে মা তার ছেলের পরিণতির কথা ভেবে কান্নাজড়িত কণ্ঠে কয়েন দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এই দৃশ্যটি ধারণ করার জন্য নির্দেশক অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সমস্ত চলচ্চিত্রে মাত্র এখানেই এসে তিনি কামেরায় বাকা এঙ্গেল ব্যবহার করেছেন। এর মধ্যে দিয়ে তিনি বিস্তৃত কথা না বলে শুধু এঙ্গেলের মধ্যে দিয়ে উক্ত অর্থ সম্পর্কে এবং এর সাথে অর্থসংশ্লিষ্ট মানুষগুলোর প্রতি যে দৃষ্টি ভঙ্গি অত্যন্ত সুচারুভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন।

তৃতীয় অধ্যায়

ঘাটু গানে নারী শিল্পী

৩.১ বাঙলার অভিনয়ে নারী শিল্পী

৩.২ বাংলাদেশের অভিনয়ে নারী শিল্পীদের আর্থ-সামাজিক জীবন

৩.১ বাঙলার অভিনয়ে নারী শিল্পী

এক সময় বাঙলার অভিনয়ে নারী চরিত্র উপস্থাপনে পুরুষেরাই অংশগ্রহণ করতো। আমাদের দেশের ঐতিহ্যবাহী সংযাত্রা ও কালিকাছ এর উৎপত্তির সময় থেকেই উক্ত প্রযোজনাগুলোতে নারীচরিত্র উপস্থাপনে পুরুষেরা অংশগ্রহণ করে আসছেন। এর পাশাপাশি লেটো গান, তামসা বা মাইট্যা তামাসা, ঘাটু গান ও অষ্টক গানসহ কয়েক ধরনের যাত্রায় অল্প বয়স্ক কিশোর-যুবারাই নারী চরিত্র উপস্থাপন করে থাকে। আহমেদ (১৪০০) বলেন,

> সাধারণ ভাবে মনে করা হয় যে বাংলাদেশের নাট্যে নারী কুশীলবের উপস্থিতি ঊনবিংশ শতকের পূর্বে অপ্রচলিত ছিল। পুরুষ ও নারী চরিত্রের কুশীলবদের স্ত্রী-পুরুষ বিচার সম্পর্কে ইউজেনিও বারবার নতুন তত্ত্বের পরে এই বিষয়ে অনুসন্ধান বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। বারবার মতে, পৌরুষ ও নারীত্ব যথাক্রমে কেবল পুরুষ ও নারী দ্বারাই যে সর্বোত্তমভাবে রূপায়িত হবে, এটি স্বতসিদ্ধ নয়। (পৃ: ১২৯)

আমাদের দেশের লোক নাটকের অভিনয়ের ক্ষেত্রে অনেকাংশে নারী চরিত্র উপস্থাপনে পুরুষেরা অংশ গ্রহণ করে থাকেন। বাংলাদেশের নাটকে বিশেষ করে লোকনাট্যে স্ত্রী চরিত্র উপস্থাপনে পুরুষের ভূমিকা সম্পর্কে আহমেদ (১৪০০) বলেন, বর্তমানকালেও বাংলাদেশের লোকনাট্যের কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্ত্রী ভূমিকায় পুরুষ কুশীলব অভিনয় করে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি রাজশাহী অঞ্চলের 'আলকাপ', ময়মনসিংহ অঞ্চলের 'ব্যইদ্যানির [যদৃষ্টং] গান' বা 'মাইট্যা তামশা' ও 'ঘাটু গান' এবং রংপুর অঞ্চলের 'ছোকরা নাচ' ইত্যাদির কথা উল্লেখ করেন। এসকল অভিনয় অনুষ্ঠান (Performance) এ পুরুষ কুশীলব অভিনয় ও নাচের পাশাপাশি গানও গেয়ে থাকেন। কুশীলবদের বয়স ১৪ বছরের কাছাকাছি, এরা শাড়ি ও লম্বা পরচুলা ব্যবহার করেন অথবা ক্ষেত্র বিশেষে বড় চুল রাখেন। ঘাটু গানে সাধারণত, চার থেকে পাঁচ জন ছেলে সমবেত গান ও বাজনার সাথে নেচে গেয়ে মুকাভিনয় ঢঙে চরিত্রাভিনয় করে চলে। তিনি উল্লেখ করেন এসময় তারা যেসব গানগুলো পরিবেশন করে সেগুলো মূলত আদি রসাত্মক। এসকল অভিনয় ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত না হলেও এর মূল বিষয় হয়ে থাকে রাধা-কৃষ্ণের উপাখ্যানকে কেন্দ্র করে। নাচ ও গানে পারদর্শী ছেলেদেরকে ঘাটু দলে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রচুর চাহিদা দেখা যায়। এসমস্ত ছেলেদেরকে ঘাটু দলের দলনেতা, যিনি দলের প্রাক্তন অভিনেতাও বটেন, তিনি তাঁদেরকে তালিম দেন এবং এর বিনিময়ে মাসিক মাসোহারা প্রদান করেন। ঘাটু দলের ছেলেদের উপর যৌন নিপীড়ন ঘটে এমনকি তাদেরকে কেন্দ্র করে দলের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের বিবাদেরও সৃষ্টি হয়ে থাকে।

ঘাটু গানের মত পরিবেশনা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ‘ছোকরা নাচ’ ধর্মীয় আচার সম্পর্কিত না হলেও তার আদিরসাত্মক আবেদনের জন্য বিখ্যাত। *ময়মনসিংহ গীতিকার* ‘মহুয়া’ উপাখ্যানের উপর ভিত্তি করে পরিবেশিত বাইদ্যানির গানে ‘সং নাচ’ অন্তর্ভুক্ত এবং নারী ভূমিকায় পুরুষ কুশীলব অংশগ্রহণ করে থাকেন। প্রায় আশি বছর আগে পদ্মার পূর্বপারের বাংলায় বাইদ্যানির গান ছিল ব্যাপকভাবে সমাদৃত।

চিত্র-৫ : বাইদ্যানির গান, নেত্রকোনা। ছবি: সংগৃহীত

সে সময় বিভিন্ন পেশার মানুষের মাঝে মহুয়া উপাখ্যান ভিত্তি করে শখের অভিনয় পরিবেশনার যে রেওয়াজ প্রচলিত ছিল, নিম্নে উদ্ধৃত কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের লোকগীতি (ঘোষা গান) হতে সেটি অনুমান করা সম্ভব:

মামু হইল উমরা বাইদ্যা, ভাইগনা বাইদ্যানি
ভাতিজা উঠিয়া বলে চাচা আমি লবজানি ॥

অষ্টক দলে সাধারণত চারজন কিশোরী থাকে যারা পুরুষ গায়কের দলের সাথে মুকাভিনয়মূলক নৃত্য পরিবেশন করে। তিনি উল্লেখ করেন যে, অষ্টক শুধু যে নারী কুশীলব দ্বারাই পরিবেশিত হয় তা নয়, বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে পুরুষ কুশীলব দ্বারা গঠিত দল এবং পুরুষ ও নারীদের সম্মিলিত দলের অস্তিত্বের কথাও জানা যায় (পৃ: ১৪১-১৪৩)।

ইতিহাসের পাতা থেকে আমরা জানতে পারি যে, বাংলার অভিনয়ে নারী ও পুরুষের অংশীদারিত্ব কোন অংশেই কম নয়। পুরুষের পাশাপাশি নারীরা সব সময়ই কোন না কোন ভাবে অভিনয়ের সাথে যুক্ত থাকার জন্য সচেষ্ট ছিল, কিন্তু সমাজ ও বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতা তাদের সে পথকে থমকে দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে আহমেদ (১৪০০) বলেন,

...ইতিহাসের প্রথম যুগ হতে মধ্যযুগের প্রারম্ভিক অধ্যায় পর্যন্ত সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশ, বিশেষত বাংলার অভিনয়রীতির এই সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা এমন একটি ঐতিহ্যের প্রতি সুস্পষ্ট নির্দেশ করে যেখানে পুরুষ ও নারী উভয়ের অংশীদারিত্ব স্বীকৃত। কিন্তু মধ্যযুগের প্রথমার্ধে (১৩ থেকে ১৬ শতক) একটি স্পষ্ট পরিবর্তন ঘটায় এই প্রেক্ষাপট থেকে আপাতঃদৃষ্টিতে নারী কুশীলব অন্তর্হিত হয়। এই অন্তর্ধানের অন্তরালে তিনটি কারণ নির্ণয় করা যেতে পারে:

১. মুসলিম শাসন,

২. বৈষ্ণব নাট্য-গীত চর্চা ও

৩. সামাজিক রাজনৈতিক প্রভাব বিচ্ছিন্ন নান্দনিক চাহিদা যা animus ও anima ধারণা স্বীকার করে।

(পৃ: ১৪৩-১৪৪)

বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের আলোকে আমরা জানি যে, সামাজিক প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে যেসব নারী কুশীলববৃন্দ অভিনয়ের সাথে সম্পৃক্ত থাকতেন সমাজ তাদেরকে কখনও ভাল চোখে দেখেনি বরং প্রতিনিয়ত সামাজিক গঞ্জনার স্বীকার হতে হয়েছে। সামাজিক পদমর্যাদার দিক থেকে তাদেরকে অত্যন্ত নিম্ন পর্যায়ের এবং কি বেশ্যা স্বরূপ নিরূপণ করা হত। তাই ১৬ শতকের অত্যন্ত জনপ্রিয় কৃষ্ণ যাত্রার বিভিন্ন অভিনয়ে এই সব নারীদেরকে পরিহার করে সেখানে পুরুষেরাই নারীদের চরিত্র রূপায়ণ করেন। ১৬ শতকের বৈষ্ণববাদের প্রসার ও কৃষ্ণ যাত্রা প্রসঙ্গে আহমেদ (১৪০০) বলেন,

> ১৬ শতকে বৈষ্ণববাদ প্রচারের সাথে সাথে কৃষ্ণ যাত্রা, কীর্তন ইত্যাদি বৈষ্ণব নাট্যগীতচর্চা বাংলার প্রধান সাংস্কৃতিক ধারায় পরিণত হয় এবং বিভিন্ন কারণে বৈষ্ণবগণ নারী কুশীলব বিবর্জিত অভিনয় রীতি অবলম্বন করেন।...কিন্তু ১৩ শতকে মুসলিম ও ১৬ শতকে বৈষ্ণব – পরপর এই দুই পিতৃতান্ত্রিক আঘাতের পর মাতৃতান্ত্রিকতার ভিত ক্রমশ ন্যুব্জ হয়ে পড়ে। ফলে ১৬ শতকের শেষ নাগাদ বাংলায় একটি প্রগাঢ় সামাজিক পরিবর্তন ধরা পড়ে : পিতৃতান্ত্রিকতার সুস্পষ্ট অগ্রগতি। পরিণতিতে পুরুষ আধিপত্য ক্রমশ প্রবল হয় এবং নারীদের স্থায়ীভাবে অন্তঃপুরে প্রেরণ করা হয়। পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিতে জনসমক্ষে নারী কুশীলবকৃত সকল প্রকার পরিবেশনা কাম প্রবৃত্তিমূলক লেভেল দ্বারা চিহ্নিত হয়। উপরন্তু নারীকুশীলবকৃত পরিবেশনাসমূহ পুরুষতন্ত্রে বিভেদ ও উচ্ছৃঙ্খলা সৃজনে সক্ষম হেতু এসকল পরিবেশনা পুরুষ আধিপত্য বিস্তারের পথে বাধাস্বরূপ ও অনাকাঙ্ক্ষিত বিবেচিত হয়। ফলে, জনসমক্ষে নারী কুশীলবকৃত সকল প্রকার পরিবেশনাকে হয় দমন, নয় কালিমা লেপন

করা হয়। তিনি তার প্রবন্ধের বিভিন্ন আলোচনার সাপেক্ষে বলেন যে, আমাদের বাংলায় নারী কুশীলব সকল যুগেই অভিনয় করেছেন, তবে কখনও সাংস্কৃতিক মূলধারায় আবার কখনও বা প্রান্তিক উপধারায়। সেই সাথে সাথে আমাদের বাংলা তথা সমগ্র ভারতীয় নাট্য ঐতিহ্যে কুশীলবের লিঙ্গ ও চরিত্রের লিঙ্গ এই দুইয়ের মধ্যেকার বিভেদ কখনও স্বীকৃত হয়নি। আর সে কারণেই মুসলিম বিজয়পূর্বে বাংলায় নারী ও পুরুষ কুশীলব উভয়েই নারী ও পুরুষ চরিত্রে অভিনয় করেছে। কিন্তু বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অবস্থান বিচার পূর্বক আমরা দেখতে পাই যে তৎকালীন পুরুষশাসিত সমাজে নারী কুশীলবের অবস্থান ভোগ্যপণ্যের স্বরূপ। যদিও বারবাকৃত মন্তব্য সত্য যে নারী ও পুরুষ কুশীলব নারী ও পুরুষ উভয় চরিত্র রূপদানে সক্ষম, তবুও একথাও সত্য যে পুরুষ শাসিত সামাজিক ব্যবস্থায় নারী কুশীলবের উপস্থিতি অথবা অন্তর্ধান পুরুষের চাহিদা দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। (পৃ: ১৪৫-১৪৭)

বিশ্ব ইতিহাসে ও আমাদের দেশের নাটকে নারীর উপস্থিতি প্রসঙ্গে আহমেদ (১৪০০) বলেন, ক্লাসিকীয় গ্রীক যুগের ট্র্যাজেডি, কমেডি ও সাতির এবং এলিজাবেথীয় যুগের কোন নাট্য প্রযোজনায় নারী কুশীলব (Performer) এর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় না, যদিও উল্লিখিত যুগের নাটক বিশ্বনন্দিত। জানামতে পাশ্চাত্যের নাট্যে নারী কুশীলবের সর্বপ্রথম পদার্পণ ঘটে রোমান যুগের '*মাইম*' নামক (আধুনিক মুকাভিনয় নয়) নাট্যরীতির মাধ্যেমে।...আদিতে নারী কুশীলব কর্তৃক স্ত্রী চরিত্র অভিনীত হলেও অষ্টাদশ শতকের শেষে নারী কুশীলবের জন্য মঞ্চ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এই ক্ষেত্রে অবশ্য জনগণের মূল্যবোধ-অবক্ষয় সংক্রান্ত আশঙ্কা ছিলনা, ছিল খোদ অভিজাতবর্গের নারী কুশীলব সংক্রান্ত কলহ। অবশেষে ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে নারী কুশীলব ফিরে আসেন চীন দেশের নাট্যমঞ্চে।

সাধারণ ভাবে মনে করা হয় যে বাংলাদেশের নাট্যে নারী কুশীলবের উপস্থিতি উনবিংশ শতকের পূর্বে প্রচলিত ছিল। যদি লেবেদেফ (কাল্পনিক সংবদল, ১৭৯৫) ও নবীন চন্দ্র বসু (বিদ্যাসুন্দর, ১৮৩৫) প্রযোজকদ্বয়ের বিচ্ছিন্ন চেষ্টাগুলোকে গণনায় না আনা হয় তবে ধরে নেওয়া যায় ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে অভিনীত শর্মিষ্ঠা নাটকে জগদতারিণী, গোলাপ, এলোকেশী এবং শ্যামা বাংলার নাট্যমঞ্চের ইতিহাসে লিপিবদ্ধকৃত প্রথম নারী কুশীলব। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বিশ শতকের পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত যাত্রায় পুরুষ কুশীলব দ্বারা স্ত্রী চরিত্র অভিনয় ছিল প্রচলিত প্রথা। উল্লিখিত তথ্যের আলোকে তিনি প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, নারী কুশীলব দ্বারা স্ত্রী চরিত্র অভিনয় কি আদৌ অপরিহার্য ? এই প্রশ্নের আলোকে তিনি গ্রীক ট্র্যাজেডি ও কমেডি, শেক্সপিয়ারের সকল নাটক, নো ও কাবুকি নাটক, বেইজিং অপেরা ইত্যাদির উল্লেখ করে বিপক্ষে জবাব দেন। তিনি বলেন

ইউজেনিও বারবা একারণেই দাবি জানিয়েছেন যে চরিত্র চিত্রণ বিচারে কুশীলব পুরুষ কি নারী — সে বিষয়টি অপ্রাসঙ্গিক। উল্লিখিত কথার সূত্র ধরে বিখ্যাত অভিনেতা মেই লাং ফাং এর প্রযোজনা গুলোতে আমরা এর প্রতিফলন দেখতে পাই (পৃ: ১২৯-১৩০)।

ইউ টিউবে প্রদত্ত মেই লাং ফাং এর The Drunken Beauty, Farewell my concubine সহ প্রভৃতি পরিবেশনায় এর পরশ পাওয়া যায়।

চিত্র-৬ : মেই লাং ফাং ছবি: সংগৃহীত

মেই লাং ফাং প্রসঙ্গে Tian (2000) বলেন,

> In the Qing dynasty, owing to the repeated bans of performences featuring female singers and dancers, of which the most consequential was Emperor Qianlong's in 1712, female impersonation again predominated and paved the way for a host of artists of the speciality in the late nineteenth and early twentieth centuries. They were led by Mei Langfang-arguably the most renowned female impersonator in the history of the theatre. (80-81)

তাঁর উপস্থাপিত অভিনয়ের মধ্যে আমরা নারী ও পুরুষের চমৎকার মেলবন্ধন পাই। তিনি যখন অভিনয় শুরু করেন তখন প্রাক প্রকাশক স্তরে অভিনেতার পরিচয় গৌণ হয়ে উঠে। প্রাক-প্রকাশক স্তরে অভিনেতার উপস্থিতি সম্পর্কে বারবা (১৯৯১) বলেন,

> পুরুষ এবং নারী দ্বারাই সব সময় পৌরুষ ও নারীত্ব প্রকাশিত হবে এটা ঠিক নয়। প্রাক- প্রকাশক পর্যায়ে অভিনেতার লিঙ্গ পরিচয় কম গুরুত্বপূর্ণ। টিপিক্যাল পৌরুষ ও নারীত্ব- এর কোন অস্তিত্ব নেই৷ প্রতিটি মানুষের মাঝেই রয়েছে নমনীয় anima শক্তি এবং শৌর্যবান animus শক্তি। যে কোন কুশীলব যখন মঞ্চে তার উপস্থিতিকে উপরে আলোচিত শক্তি দ্বয়ের সাহায্যে দৃশ্যমান ও চরিত্রের রূপায়ণ ঘটান তখনি মূলত পৌরুষ ও নারীত্বকে প্রত্যক্ষ করা যায়। (পৃ: ৭৯-৮১)

রহমান ও আহমেদ (২০০৫) বলেন, তামাশা কাহিনী প্রধান হলেও এর মধ্যে নৃত্য গীতের আধিক্য বেশি। এর অধিকাংশ সংলাপ নৃত্য গীতের মাধ্যেমে উপস্থাপিত হয়। তামাশায়ও ঘাটু গানের মত নারী চরিত্র পুরুষেরাই রূপ দান করে। তিনি উল্লেখ করেন, এখানে বয়সের কোন পরিসীমা নাই তবে চরিত্রের ক্ষেত্রে ঘাটুর মত মেয়েলিপনা দেখা যায়। তামাশায়ও ঘাটুর মত উপস্থাপনারীতিই মুখ্য (পৃ: ৪৯)।

ঘাটুদের পোশাক ও মেক-আপ সম্পর্কে রহমান ও আহমেদ (২০০৫) বলেন,

> ঘাটুর পোশাক ও মেক-আপ অন্যান্য লোকনাট্যের অভিনেতাদের মতো। অত্যন্ত রঙ চঙে শাড়ি, ব্লাউজ পড়িয়ে ঘাটুকে অনিন্দ্য সুন্দরী রূপে মঞ্চে উপস্থাপন করা হতো। প্রতিপক্ষ ও দর্শকের কাছে তাকে অসাধারণ রূপবতী প্রমাণ করার জন্য ফ্যান্টাসি মেকআপ ব্যবহৃত হতো। ঘাটুর পায়ে থাকতো নূপুর, যেহেতু অভিনেতা অভিনেত্রী দুই এর অধিক হতো না সেহেতু স্বল্প পরিসরের মঞ্চে ঘাটু অভিনীত হতো। (পৃ: ৪৯)

সাজসজ্জার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৮২) বলেন, বেশ ভূষা সংক্রান্ত বিধি আহার্য অভিনয় নামে পরিচিত। নাটকের পাত্র পাত্রীর জন্য এর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কেননা এর মাধ্যেমেই অভিনেতারা নিজেদের অভিব্যক্তি ব্যক্ত করেন। তিনি নাটকের পাত্র-পাত্রীর বেশভূষাকে চার ভাগে ভাগ করেছেন। যথা — পুস্ত, অলংকার, অঙ্গরচনা ও সঞ্জীব। তিনি পুস্ত ও অলংকারের বিভিন্ন প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করেন। আমরা দেখতে পাই যে এর সাহায্যে অভিনেতারা তাদের চরিত্রকে উপস্থাপন করতেন (পৃ: ৮১-৮৫)।

ঘাটু গানের অভিনেতাদের মধ্যেও আমরা উপরে আলোচ্য অলংকার ও অঙ্গরচনার প্রভাব দেখতে পাই। মধ্যযুগের অনেক সাহিত্যে আমরা দেখতে পাই নারী চরিত্র পুরুষ কুশীলবদের দ্বারা উপস্থাপন করতে৷ আহমেদ (১৪০০) বলেন,

> ...বিস্ময়করভাবে চৈতন্যের কৃষ্ণযাত্রা সম্পূর্ণরূপে পুরুষ কুশীলব দ্বারা অভিনীত হতে দেখা যায়। *চৈতন্য ভাগবত* (১৫৪৮) এ বৃন্দাবন এরূপ একটি অভিনয় অনুষ্ঠানের কথা উদ্ধৃত করেছেন যেখানে

> চৈতন্য স্বয়ং অভিনয় করেছেন রুক্মিনী চরিত্রে, সাথে কৃষ্ণ চরিত্রে ছিলেন অদ্বৈতাচার্য এবং বুড়ি বড়াই চরিত্রে নিত্যানন্দ।...পুরুষ কুশীলবদের রূপসজ্জা এতটা নিখুঁত হয়েছিল যে উপস্থিত ভক্তকুল কুশীলবদের প্রকৃত পরিচয় সনাক্ত করতে ব্যর্থ হয়। আরও জানা যায়, সতের শতকে কৃষ্ণশেখর দাস রচিত *হরিবিলাস* নামের অপর এক কৃষ্ণ যাত্রাপালা রচয়িতার এক শিষ্য রাধার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। (পৃ: ১৩৮)

ইমাম (১৯৯২) বলেন, উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে কলকাতায় ধনী এবং নব্য শিক্ষিত বাঙালীদের উৎসাহ ও অর্থানুকূল্যে বাংলা নাটক মঞ্চায়নের জোয়ার জাগে।...সে যুগের নাট্যচর্চার একটি বৈশিষ্ট ছিল — অভিনয়ে ছেলেরাই মেয়েদের ভূমিকায় নামতেন। ১৮৭২ সালে ন্যাশনাল থিয়েটারে দিনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের যে অভিনয় হয়, তাঁতে পরবর্তী যুগের বিখ্যাত অভিনেতা অমৃত লাল বসু সৈরিন্ত্রীর ভূমিকায় মহিলার মেক-আপ গ্রহণ করেছিলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত তখন নতুন নতুন নাটক লিখছেন এবং সেগুলি বিভিন্ন নাট্যশালায় অভিনীত হচ্ছে। তিনি প্রস্তাব করলেন নাটকে নারী চরিত্র মহিলা দ্বারা অভিনীত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তার পরামর্শ গ্রহণ করে বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত এক নাটকে সর্বপ্রথম মহিলারা মঞ্চে অবতীর্ণ হন। এ নিয়ে সে যুগে যথেষ্ট আলোড়ন উঠেছিল৷ পত্র-পত্রিকায় বিরূপ সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল এমনকি, যে উদারমনা সমাজ- সংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও অন্যান্যদের সঙ্গে বেঙ্গল থিয়েটার পরিচালনা কমিটিতে যুক্ত ছিলেন। তিনি পর্যন্ত এর বিরোধিতা করে থিয়েটারের সংশ্রব ত্যাগ করেন। তিনি উল্লেখ করেন ঢাকাতেও নাট্যচর্চা হত, রঙ্গমঞ্চও ছিল কয়েকটি কিন্তু সবখানে পুরুষেরাই স্ত্রীচরিত্রে অভিনয় করতেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র- শিক্ষকদের যৌথ-প্রচেষ্টায় কার্জন হল, জগন্নাথ হল ও সলিমুল্লাহ হলে প্রায়ই নাট্যঅভিনয় হত। বলাই বাহুল্য, সে সব নাটকেও ছাত্ররাই মেয়েদের ভূমিকায় অভিনয় করতেন।

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পরও এই ধারাই চলে আসছিল। ১৯৪৮ সালে কমলাপুর ড্রামাটিক এসোসিয়েশনের তত্ত্বধানে মঞ্চায়িত হয়েছিল 'টিপু সুলতান'। তিনি উল্লেখ করেন, এ নাটকেও স্ত্রী চরিত্রগুলি পুরুষেরাই করেছিলেন। কেবল একটি কিশোরী চরিত্রে নামানো হয়েছিল পাড়ারই একটি কিশোরী মেয়েকে। অপরদিকে উর্দু ভাষী ঢাকাইয়া লোকেরা উর্দু নাটক করতেন। তাদের দলের নাম ছিল 'নিউ থিয়েটার'। সপ্তাহে দু-তিনদিন তাদের নাটক হত, বাকি দিনগুলো মঞ্চ খালি পড়ে থাকতো। এমনি একটা খালি দিনে ঐ মঞ্চে অভিনীত হল একটি বাংলা নাটক 'উদয় নালা' সেটা ছিল ১৯৪৯ সাল৷ নাটকটিতে মহিলা চরিত্রে পুরুষেরাই অভিনয় করেন কেবল একটি চরিত্রে একজন জলজ্যান্ত মহিলাকে মঞ্চে দেখা যায়। এর বছর খানেক পর থেকেই মহিলারা নাটকে অবতীর্ণ হতে থাকেন (পৃ: ৬৩-৭১)।

৩.২ বাংলাদেশের অভিনয়ে নারী শিল্পীদের আর্থ-সামাজিক জীবন

আমাদের দেশে অনেক নাট্য-আঙ্গিকে বর্তমানে নারীরা অভিনয় করলেও তাঁরা বিভিন্নভাবে সমাজ ও অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে বিড়ম্বনার স্বীকার হন। এখনও আমরা তাদেরকে ভাল ভাবে গ্রহণ করতে পারি নি। এ প্রসঙ্গে আহমেদ (১৪০০) বলেন,

> "ইদানিং আলকাপ ও বাইদ্যানির গানে নারী কুশীলব অভিনয় করলেও তাঁরা যাত্রা অভিনেত্রীদের মতই সামাজিকভাবে নিগৃহীতা এবং নষ্টা হিসেবেই চিহ্নিত" (পৃ: ১৪২)।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশের তথা ভারতীয় উপমহাদেশের সংস্কৃতিতে মাতৃতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। কিন্তু বর্তমান সমাজে প্রচলিত পিতৃতন্ত্র একে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে। আহমেদ (১৪০০) বলেন, ঐতিহাসিক বিচারে দেখা যায় ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাক-বৈদিক যুগে কৃষিজাত অর্থনীতি যখন ভ্রূণাবস্থায় বিরাজমান তখনও মাতৃ-অধিকার ছিল সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত৷ আর্য সংস্কৃতির ইতিহাস এই মাতৃ-অধিকার প্রবলভাবে দমনপূর্বক পিতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা প্রচলনের ইতিহাস। আর্যগণ কর্তৃক অনার্য (দ্রবিড় এবং অন্যান্য 'দস্যু-দাস') জাতিসমূহকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করানোর ফলে দৈহিক শ্রম সুলভ হয়ে পড়ে। এর পরিণতি স্বরূপ নারীগণ তুলনামূলকভাবে কম উৎপাদনশীল বিবেচিত হন এবং একই সাথে তাদের সামাজিক অবস্থান ক্রমশ নিম্নমুখী হতে থাকে। পিতৃতন্ত্র কর্তৃক নারীদের তাদের পূর্ব মর্যাদাবান অবস্থান হতে অপসারণের প্রক্রিয়া আরম্ভের সাথে সাথে, অনেকটা প্রাথমিক ক্ষতিপূরণমূলক ব্যবস্থা হিসেবে মাতৃদেবীরূপে নারীকে দেবতুল্য করে তোলা হয়। কিন্তু পিতৃতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হলে সে ব্যবস্থাটুকুও অবলুপ্ত হয়ে যায়। তিনি বলেন যে, সকল যুগেই নাট্য কুশীলবগণ সমাজের একটি বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায় হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এই কুশীলব সম্প্রদায়ের সামাজিক অবস্থান সকল যুগেই প্রান্তিক এবং তাঁদের কমবেশী অচ্ছূৎ রূপেই গণ্য করা হয়েছে। তাঁদের অস্তিত্ব সকলক্ষেত্রেই প্রথাগত ব্যবস্থার প্রতি হুমকিস্বরূপ। পুরুষশাসিত সমাজে নারী কুশীলবগণ দ্বিগুণ হুমকির কারণ: তাঁরা পুরুষের অহম মুহূর্তেই ধ্বংস করতে সক্ষম। একারণেই, জনগণের নৈতিক অবক্ষয়ের ধুয়ো তুলে তাঁদের মঞ্চ হতে দূরে রাখার চেষ্টা চলে বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানদের দ্বারা, অথবা তাঁদের সুচিন্তিতভাবে কোণঠাসা করে ফেলা হয় বৈষ্ণব ও মুসলমানদের দ্বারা (পৃ: ১৪৫-১৪৭)। আমাদের বর্তমান সভ্যতায় এসে একবিংশ শতাব্দীর দিকে তাকালে আমরা বিশ্বসভ্যতা তথা মানবসভ্যতার অনেক বিস্ময়কর সাফল্য, জ্ঞান-বিজ্ঞানের, প্রযুক্তির নানামুখী অগ্রগতি, অভাবনীয় সাফল্য ও উন্নয়ন অর্জনের পেছনে নারীদের অগ্রণী ভূমিকা দেখতে পাই। কিন্তু এর পাশাপাশি আমরা এটাও দেখতে পাই যে, বিশ্বের দেশে দেশে নারীর জীবনের নানামুখী প্রকাশ ও তার জীবনের নিরাপত্তা হুমকির মুখোমুখি এবং সংকটাপন্ন। লিঙ্গ সমতা এখনও সমভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। গৃহে, পরিবারে, সমাজে, কর্মক্ষেত্রে, রাষ্ট্রে; নারী দৈহিক, মানসিকসহ অন্যান্যভাবে নির্যাতনের

স্বীকার হচ্ছেন। নানাভাবে আমাদের সমাজের নারীরা বঞ্চনার স্বীকার। তাদেরকে বিভিন্নভাবে সুকৌশলে অনেক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। এ প্রসঙ্গে উমর (২০০৩) বলেন,

> ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবের প্রাথমিক পর্যায়েই নারী-পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটে সেটা হলো, সন্তানদের পরিচয় মায়ের দিক থেকে না হয়ে বাবার দিক থেকে হওয়ার নিয়ম বলবৎ হওয়া। এঙ্গেলস একে বলেছেন মাতৃ অধিকার (Mother right) উচ্ছেদ। এই মাতৃ অধিকার উচ্ছেদের ফলে সন্তানদের পরিচয় যখন বাবার দিক থেকে শুরু হয় তখনই ঘটে নারীর অবস্থানের মধ্যে এক মৌলিক পরিবর্তন, যে পরিবর্তনের ফলে নারী শুধু বাইরের জগতেই নয়, নিজের পরিবারের মধ্যেও প্রকৃতপক্ষে পরিণত হয় এমন এক দাসে যার কাজ দাঁড়ায় সন্তান-উৎপাদন ও সংসার দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করা। (পৃ: ১১৮-১১৯)

এর আলোকেই আমরা অনুধাবন করতে পারি যে নারীদেরকে অনেক প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে সমাজে টিকে থাকতে হয়। তাই কোন নারী যদি নিজেকে শিল্পের বিভিন্ন শাখায় সংশ্লিষ্ট রাখতে চান তাকে চরম সংগ্রাম করতে হয়। আমাদের সমাজে যে সব নারী কুশীলববৃন্দ রয়েছেন তারা প্রিতিনিয়ত সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে তাদের অবস্থান তুলে ধরছেন। ঢাকা মহানগরীর নাট্য চর্চা প্রসঙ্গে ইমাম (১৯৯২) বলেন,

> ঢাকা মহানগরী নাট্যচর্চা এদেশের নাটকের অঙ্গনে মহিলা শিল্পীদের স্বছন্দ বিচরণে এখনো অনেক বাধা রয়েছে। পুরুষ-শাসিত সমাজে জীবন-যাপন প্রণালীর নানা রকম বিধি-নিষেধ, জটিলতা, সংকীর্ণতা, অর্থনৈতিক পরাধীনতা ইত্যাকার নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা মহিলাদের নিজ ইচ্ছামত যেকোন স্বাধীন পেশা গ্রহণ তা শিল্পচর্চার পথে এখনো অন্তরায়। তবে এসব বাধা নিরসনের জন্য যে দীর্ঘ ও নিরলস সংগ্রাম শুরু হয়েছে, নানা বাধাবিপত্তি পার হয়ে হয়ে তা ধীর লয়ে এগিয়ে চলেছে — এইটাই আশার কথা। (পৃ: ৭৩)

চতুর্থ অধ্যায়

দেশী (দেশজ) সাংস্কৃতিক উপস্থাপনার (পারফরমেন্স) সঙ্গে ঘাটু গানের তুলনা

৪.১ সংযাত্রা

৪.২ কালিকাছ

৪.৩ মহিষাসুর বধ

৪.১ সংযাত্রা:

আভিধানিক অর্থে ‘সঙ’ শব্দটির অর্থ হচ্ছে অদ্ভুদ পোশাকধারী কৌতুককারী অভিনেতা। কিন্তু আমাদের দেশে ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্যের ভাষায় সংপালা বা সংযাত্রা বলতে আমরা দর্শকদের উপস্থিতিতে অদ্ভুদ পোশাক-আশাক সহ আসরে পরিবেশিত অভিনেতার অভিনয়কে বুঝে থাকি। সংযাত্রার উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৯৬) বলেন,

> প্রাচীনকাল হতে এদেশের মানুষ বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের পোশাক পরে অঙ্গভঙ্গি সহযোগে গান, ছড়া অভিনয় ইত্যাদির আশ্রয়ে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের বিভিন্ন পরিহাসোজ্জ্বল ঘটনার অনুকরণ করে দেখাতো। তখন সে ধরনের পরিবেশনাকে ‘সমাঙ্গ’ বলা হতো। গবেষকদের ধারণা, এই সমাঙ্গ শব্দ হতে ‘সরঙ্গ > ‘সঙ’ শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। ছদ্মবেশ অর্থে ‘সঙ’ শব্দটি বাংলাদেশে আঠারো শতকের শেষ দশক পর্যন্ত প্রচলিত ছিল (পৃ:৩)
> ।

বাংলার ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্যের অন্যতম উপাদান হচ্ছে সংযাত্রা । কালের বিবর্তনে বাঙালি সংস্কৃতির যে উপাদানগুলো দিন দিন কালের গর্ভে হারিয়ে যাচ্ছে সংযাত্রা এর মধ্যে অন্যতম । যা বাংলাদেশের অঞ্চল ভেদে কোথাও কোথাও সংযাত্রা, সংখেলা, কমিক বা সং পালা নামে পরিচিত। তবে সাহিত্য জগতে বা অধিকাংশ মানুষ একে সংযাত্রা নামেই চেনেন । লোকনাট্য বিভিন্ন গবেষক ও পণ্ডিতদের গবেষণাধর্মী জ্ঞানগর্ভ আলোচনার আলোকে লোকনাট্য সম্পর্কে চক্রবর্তী (১৯৯৯) বলেন, লোকনাট্য বলতে বিশেষ এক শ্রেণীর নাট্যগুণ সম্পন্ন মৌখিক সৃষ্টিকে বোঝায় যা সংহত সমাজে যেমন প্রচলিত আছে, তেমনি সংহত সমাজ এর দ্বারা অনির্বচনীয় আনন্দ লাভ করে। ... মহাকাব্যকে যেমন authentic epic এবং literary epic — এই দু’ভাগে বিভক্ত করা হয়, তেমনি লোকনাট্যকেও খাঁটি লোকনাট্য authentic folkdrama এবং রীতিসম্মত লোকনাট্য বা literary folkdrama — এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। খাঁটি লোকনাট্য যেখানে স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টি, অকৃত্রিম, স্বাভাবিক, সেক্ষেত্রে রীতিসম্মত লোকনাট্য বা যাত্রা হ’ল শিক্ষিত বা শিক্ষিতকল্প নাট্যকারের পরিকল্পনা প্রসূত, আসরে অভিনয় করার বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে চেষ্টাকৃত ভাবে রচিত ও সর্বোপরি কৃত্রিম। আমাদের যাত্রা নাটকগুলি এই শেষোক্ত শ্রেণীর লোকনাট্য — সাহিত্যিক লোকনাট্য। (পৃ:৫২৪-৫২৫)

একসময় মানিকগঞ্জ ও টাঙ্গাইলের প্রায় প্রতিটি গ্রামেই সংযাত্রার নিজস্ব দল ছিল। চৈত্র ও বৈশাখ মাসে এসব অঞ্চলের প্রত্যেকটি গ্রামের মানুষ সংযাত্রা বা সংপালায় মুখরিত থাকতো। সংযাত্রা হাসি, কৌতুক ও গানের সমন্বয়ে বিনোদনের সাথে সাথে সংলাপ সমৃদ্ধ অনুষ্ঠান। এখানে যারা অভিনয় করেন তারা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। যার মধ্যে কৃষক,

শ্রমিক থেকে শুরু করে খেঁটে খাওয়া অনান্য শ্রমজীবী মানুষের অংশগ্রহণই প্রধান । লোকনাট্যে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে চক্রবর্তী (১৯৯৯) বলেন,

> "লোকসাহিত্যের অনান্য শাখার মত লোকনাট্য কোন সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়, হিন্দু মুসলমান সমস্ত সম্প্রদায়ের লোকই এই লোকনাট্য রচনা করে, অভিনয় করে, দর্শন ও শ্রবণ করে" (৫২৭) ।

তাই তারা সংপালার মধ্যে দিয়ে যে গল্প বা অভিনয় তুলে ধরেন তা তাদের নিজেদের জীবনের পাশাপাশি সমাজের সর্বস্তরের মানুষের প্রতিফলন ঘটায়। এখানে লিখিত কোন পাণ্ডুলিপি থাকে না, তারা নিজেদের মত করে তাৎক্ষণিকভাবে সংলাপ তৈরি করে উপস্থাপন করে থাকে। সংযাত্রার উৎপত্তি প্রসঙ্গে বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৯৬) বলেন,

> পঞ্চদশ শতকের আগে থেকে এদেশে বিভিন্ন মেলা, উৎসব, পার্বণ ইত্যাদিতে এক ধরনের গীতিনাট্যধর্মী ব্যঙ্গাত্বক পরিবেশনা বা সঙ- এর মাধ্যেমে সামাজিক অনাচার ও পীড়নের বিভিন্ন চিত্র তুলে ধরা হতো । এছাড়া, বহু আগে হতে এদেশে 'জাত' বা 'যাত্রা' অর্থাৎ ধার্মিক অনুষ্ঠানমূলক শোভাযাত্রায় 'সঙ' সেজে অংশগ্রহণ করার রীতি প্রচলিত ছিল । পরে উনিশের শতকের প্রারম্ভ হইতে চড়ক গাজন প্রভৃতিতে গ্রামের সাধারণ মানুষের জীবনের বিভিন্ন ঘটনাকে নানা প্রকার 'সঙ' সেজে উপস্থাপন করা শুরু হয় এবং এক সময় এই সকল সং-এর অভিনয় এতই জনপ্রিয়তা পায় যে, তা পূজানুষ্ঠানের একটি মুখ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায় । ফলে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পূজা-পার্বণ উপলক্ষে সঙ বের হতে থাকে, এমনকি বিয়ে বাড়িতে আনন্দ অনুষ্ঠান পালনের জন্য সঙের ব্যবস্থা করা শুরু হয় (পৃ:৩) ।

চিত্র-১০ : সংযাত্রা, মানিকগঞ্জ।   ছবি: মেহেদী তানজির

সাধারণত সমাজের সমসাময়িক কোন ঘটনাকে উপজীব্য করে হাস্যরসের মধ্যে দিয়ে সংযাত্রার কাহিনী গড়ে ওঠে। এটি মূলত এক ধরনের হাস্যরসাত্মক বা ব্যঙ্গাত্মক নাট্যাভিনয় পদ্ধতি। প্রতি বছর চৈত্র-সংক্রান্তিতে চড়ক পূজা (যা অনেক এলাকাতে শিবের গাজন বা দেল পূজা নামে পরিচিত) উপলক্ষে বা হিন্দু সম্রদায়ের বিয়ে বা অন্নপ্রাশনসহ অন্যান্য অনুষ্ঠানে সংযাত্রা উপস্থাপিত হয়। সমাজে লোকনাট্যের ভূমিকা প্রসঙ্গে অনেকগুলো প্রবন্ধের আলোচনার অবতারনা করে চক্রবর্তী (১৯৯৯) বলেন,

> সমষ্টিগত আবেগ তৈরি করে সকলকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করা ও কর্মসিদ্ধির পথ প্রশস্ত করার মানসে আদিম নৃত্যে যে কৃত্যাভিনয় তার মধ্যেই লোকাভিনয়ের আদিম রূপ পরিস্ফুট। নৃত্য, সংগীত, গাথা-গীতিকা, সঙ, ব্রতানুষ্ঠান, পুতুলনাচ, যাত্রা ইতাদির মধ্যে দিয়ে মানুষ বিনোদনের পাশাপাশি কর্মে নতুন উদ্দীপনা পেয়ে থাকেন। লোকনাট্য শুধু নৃত্য কিংবা গীত বা উক্তি- প্রত্যুক্তি মূলক সংলাপ নির্ভর নয়। এর মধ্যে অভিনয়, সঙ্গীত, নৃত্য- মনোরঞ্জনের নানবিধ উপকরণ বিদ্যমান। লোকনাট্যে সঙ্গীতের বাহুল্য লক্ষণীয়। এ জন্য লোকনাট্যকে গীতি-নাট্য বলেও অভিহিত করা যায়। (পৃ:৫২৬-৫২৭)

মঞ্চ বা আসর:

সংপালায় বা সংযাত্রায় আলাদা করে কোন মঞ্চ প্রস্তুত করা হয় না। কারও বাড়ির উঠান বা কোন বড় মাঠের মধ্যে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। দর্শকেরা গোলাকার হয়ে আসরের বা মঞ্চের চারদিকে খড়কুটা বা বিচালি বিছিয়ে বসে উপভোগ করেন। আবার কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বর্গাকার বা আয়তাকার স্থান নির্দেশ করে তার চার কোণে চারটি বাঁশের খুঁটি পুতে তার উপর শামিয়ানা বা টিনের আচ্ছাদন দিয়ে মঞ্চ তৈরি করা হয়। তবে মঞ্চের আকার ও আকৃতি যেমনটাই হোক না কেন, দর্শকেরা এর চারদিকে বসেই অভিনয় উপভোগ করে থাকেন।

সাজসজ্জা ও পোশাক:

সংযাত্রায় অভিনেতারা নিজেদের ইচ্ছে মত করে সাজ-সজ্জা গ্রহণ করে থাকেন, যা দর্শকদের মাঝে হাসির উদ্রেক করে। এখানে অভিনেতারা বাস্তবের থেকে অতিরঞ্জন করে সাজসজ্জা গ্রহণ করে থাকেন। আর এই সাজ গ্রহণের ক্ষেত্রে তারা সাধারণত হারি-পাতিলের কালি, বাজার থেকে কেনা সস্তা স্নো পাউডার এবং বিভিন্ন ধরনের জিঙ্ক অক্সাইড তাদের উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেন। উদ্ভট ধরনের পোশাক পরে সঙের অভিনেতারা দর্শকদের আকৃষ্ট করে। পুরুষ কুশীলববৃন্দ বাহারি — পাঞ্জাবি, লুঙ্গি, শতছিন্ন জামা, পাজামা এবং এর উপরে বিচিত্র রঙের কাপড়ের তালি দিয়ে বা ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে

দর্শকদের মনোযোগ আকর্ষণ করে থাকেন। অপরদিকে নারী চরিত্রে বা ফ্যামিলি হিসেবে যারা অভিনয় করেন তারা, শাড়ি, ব্লাউজ, ওড়না এবং অনেক ক্ষেত্রে ঘাগরা বা সালোয়ার কামিজ ব্যবহার করে থাকেন।

পরিবেশনারীতি:

সাধারণত পরিচয়মূলক গান ও বন্দনা গীতের মধ্যে দিয়ে সংযাত্রার শুরু হয়। সঙ এ যে নৃত্য পরিবেশন করা হয় তা অন্য যে কোন নৃত্য ধারার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সংলাপাত্মক অভিনয় পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে সংযাত্রা উপস্থাপিত হলেও ভিন্নধর্মী নৃত্য বৈশিষ্ট্যের জন্য দর্শকেরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে এটি উপভোগ করে থাকেন। সংযাত্রায় সমস্ত কুশীলব পুরুষ৷ অর্থাৎ এখানে নারী চরিত্র উপস্থাপনে পুরুষ কুশীলবেরাই অংশগ্রহণ করে থাকেন। এই পুরুষ কুশীলববৃন্দ অনেক এলাকাতে তাদের দলের মধ্যে ফ্যামিলি নামে পরিচিত। সংযাত্রা সংলাপ ভিত্তিক চরিত্রাভিনয় হলেও গানের সাথে সাথে অভিনেতারা বিশেষ করে জোকার চরিত্রে যারা অভিনয় করেন তাদের হাত-পা ছোঁড়াছুড়ি, অঙ্গভঙ্গিমা এবং বিশেষ ভাবে বাঁকানো দেহ ভঙ্গিমা দেখে দর্শকেরা বিমুগ্ধ হন। এক থেকে তিন বা অনেকাংশে তারও অধিক সংখ্যক দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে সংযাত্রার পরিসমাপ্তি ঘটে। সংযাত্রার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হচ্ছে জোকার। প্রতিটি সঙের দলে এক বা একাধিক জোকার থাকে। যারা অত্যন্ত দক্ষ এবং যে কোন পরিস্থিতিতে নিজেদের মত করে সংলাপ তৈরি করে দর্শকদের মুগ্ধ করে রাখেন।

সংযাত্রায় নারী চরিত্র উপস্থাপনের ক্ষেত্রে অঙ্গসজ্জার সময় পুরুষ কুশীলবদের মত করে হাস্যকর করে উপস্থাপন না করে স্বাভাবিক নারীদের মত করেই তাদের উপস্থাপন করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে অভিনেতা নিজেকে নারী হিসেবে তুলে ধরার জন্য তার কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন করে থাকেন। আবার অনেকাংশে দেখা যায় যে, অভিনেতা সেটাও পরিহার করে তার স্বাভাবিক পর্যায়েই সংলাপ বলে থাকেন। সংযাত্রায় আমরা যে নারীকে দেখতে পাই তারা সমাজের সর্বস্তরের নারীদের প্রতিমূর্তি। অর্থাৎ সমাজের সকল শ্রেণির নারীদেরকেই তারা এখানে প্রতিকায়িত করে থাকেন। লোকশিক্ষা প্রদানকারী হাস্যরসাত্মক নাট্যধারা হিসেবে মানিকগঞ্জ ও টাঙ্গাইল অঞ্চলে প্রচলিত সংযাত্রায় যে ঘটনার উপস্থাপন করা হয় তা আমাদের সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংযাত্রায় উপস্থাপিত নারীদের আচরণে অনেকাংশে অতিমাত্রা ও কদর্যতাও পরিলক্ষিত হয়৷ সংযাত্রায় উপস্থাপিত নারী চরিত্রের সাথে ঘাটু গানের উপস্থাপিত নারী চরিত্রের মত করে যৌনতার কোন অপবাদ নেই। তাই সংযাত্রায় উল্লেখিত নারী চরিত্র ও ঘাটু গানে উপস্থাপিত নারী চরিত্র আলাদা বৈশিষ্ট্যের দাবিদার।

আমাদের সমতলবাসীর বৃহত্তর লোকসমাজ সমুদ্রের মত গতিশীল, সবদিক থেকে স্রোত এসে এতে মিশে যায়, গ্রহণ-বর্জনে কোন বাধা নেই। কিন্তু তুলনামূলকভাবে যদি আমরা একে পাহাড়ি পার্বত্য উপজাতি সংস্কৃতির সাথে তুলনা করি তাহলে দেখতে পাব যে পার্বত্য সংস্কৃতি বদ্ধ জলাশয়ের মতো স্রোতহীন, গতিহীন। অন্য পথের সাথে মেশার পথ এখানে

রুদ্ধ । অপরদিকে আমাদের বাংলার লোকসমাজ গতিশীল, উদার ও পরিবর্তনমুখী। আমাদের অনেকেরই ধারণা যে লোকসমাজ বা লোকসাহিত্য শুধু গ্রামকে কেন্দ্র করে তৈরি। শহরে কোন লোকসাহিত্য নেই । এরকম ধারণা একেবারেই ভুল। শহরের মানুষের দৈনন্দিন জীবনের আচার ব্যবহার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এদের জীবনের প্রত্যেকটা ঘটনা বা জীবনপ্রণালি কোন না কোন ভাবে লৌকিক উপাদানের সাথে সম্পৃক্ত। এ প্রসঙ্গে আহমদ (২০০৭) বলেন,

> আমাদের বিশ্বাস শহরের মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যেসব ধর্মীয় ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক আচার-অনুষ্ঠান পালন করে, সেসবের বিচার বিশ্লেষণ করলে তাতে নব্বই শতাংশ লৌকিক উপাদানের সন্ধান পাওয়া যাবে। বিবাহাদি সামাজিক অনুষ্ঠানে পানচিনি, গায়ে-হলুদ, ডালা প্রদান, যৌতুক, আপ্যায়ন, কনে-বিদায়, বধূ-বরণ ইত্যাদি আচারের উৎস লোকজীবনের মধ্যেই নিহিত আছে । 'মঙ্গলঘট', চিরন্তন-শিখা', 'কুশপুত্তলিকা দাহ' ইত্যাদি লৌকিক ঐতিহ্যের অঙ্গ। বাংলাদেশ বিমানের প্রতীক 'উড়ন্ত বলাকা', জনতা ব্যাংকের প্রতীক 'জীবন্ত বটগাছ' । মুক্তপক্ষ বলাকা আকাশে স্বছন্দে অবলীলাক্রমে উড়ে যায় — বাংলাদেশ বিমানে ভ্রমণ অনুরূপ স্বচ্ছন্দময়, সাবলীল ও নিরাপদ — এরূপ অর্থদ্যোতনা দেয়। ব্যাংকে অর্থ গচ্ছিত রাখলে তা বহু ডাল-পালা বিশিষ্ট বটগাছের মত স্থায়ী হবে ও বৃদ্ধি পাবে। এসব চেতনার পেছনে সমপ্রক্রিয়ার জাদুবিদ্যা (Sympathetic Magic) আছে। এটি প্রাচীন ও সর্বজনীন লোকবিশ্বাস। শহরের মানুষের বহির্জীবনে বাড়িঘর, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদির দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হয়, কিন্তু অন্তর্জীবনে পরিবর্তন অল্পই ঘটে। কোনো লোকগোষ্ঠী তার অতীতকে সম্পূর্ণ ভুলে যেতে বা মুছে ফেলতে পারে না। রূপান্তরের(Transformation) মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যেতে হয় (পৃ:১৯)।

৪.২ কালিকাছ:

আমাদের দেশে অনেক কাল আগে থেকেই সংযাত্রা, কালিকাছ, মহিষাসুর বধসহ আরও অনেক লোকজ ধর্মীয় ও বিনোদনমূলক পরিবেশনা রয়েছে যেখানে নারী চরিত্র উপস্থাপনের ক্ষেত্রে পুরুষেরা অংশগ্রহণ করে থাকেন। সংযাত্রা ব্যতীত উপরে আলোচ্য ধর্মীয় প্রার্থনার অংশ হিসেবে উপস্থাপিত সাংস্কৃতিক উপাদানগুলোতে বিশেষ করে কালিকাছ বা মহিষাসুর বধে যে নারীকে তুলে ধরা হয় তা দেবত্বের প্রতিরূপ। কালিকাছ বা কালিকাচ চৈত্র সংক্রান্তিতে পরিবেশিত কৃত্যানুষ্ঠান মূলক পরিবেশনা। এই পরিবেশনা অঞ্চল ভেদে কালিকাচ বা কালিকাছ কিংবা মুখা নাচ হিসেবেও পরিচিত। কালিকাচ প্রসঙ্গে জাকারিয়া (২০০৮) বলেন,

> কালিকাচ এক ধরনের যুদ্ধ নৃত্য। কাচ শব্দের অর্থ অভিনয়ের জন্য সাজসজ্জা গ্রহণ, কালী সেজে নৃত্যের অনুষ্ঠান হয় বলে এ শ্রেণীর নৃত্য কালিকাচ নামে পরিচিতি পেয়েছে। চৈতন্যদেব চন্দ্রশেখর আচার্যের বাড়িতে যে নৃত্যনাট্যের অনুষ্ঠান করেছিলেন তাকে কাচ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কালিকাচ শব্দটি তার মতোই প্রাচীন। কালিকাচে কালীই প্রধান নায়িকা। কখনো কখনো শিব সাজ গ্রহণ করে আবির্ভূত হয়ে থাকেন, কিন্তু তিনি কখনো নৃত্যে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন না, তার পরিবর্তে অসুর কালীর সঙ্গে নৃত্যে ও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে (পৃ:২৭৮)।

চিত্র-৭ : কালিকাছ, (রবীন্দ্র মুনি দাস, মানিকগঞ্জ।) ছবি: সুশান্ত কুমার সরকার

চিত্র-৮ : কালিকাছ, (কৃষ্ণপদ সরকার, মানিকগঞ্জ।) ছবি: মেহেদী তানজির

বাংলাদেশের মানিকগঞ্জ ও টাঙ্গাইল অঞ্চল কালীকাছের জন্য বিখ্যাত। চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে মানিকগঞ্জ অঞ্চলের কালীকাছে আমরা দেখতে পাই যে, শুরুতে কালী গৌরী সহযোগে নাচ পরিবেশন করেন। এরপর গৌরী আসর পরিত্যাগ করার পর কালী আসরে বাদ্যের তালে তালে অদৃশ্য অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হয়। বাদ্যের তালে তালে তার খরগের নাচন ও দেহ ভঙ্গিমা ভিন্ন মাত্রা তৈরি করে। জগতের সমস্ত অশুভ শক্তিকে দলিত করে তিনি অন্যায়কারীর খণ্ডিত মাথা আহরণ করে মানুষের তরে কল্যাণ সাধন করতে চান। একটা পর্যায়ে মুণ্ডুর পরিবর্তে লাল কাপড় দেখিয়ে কালীকে শান্ত করা হয় এবং কৃত্যানুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। কালী চরিত্রে যিনি অংশগ্রহণ করেন, তিনি মুখে কালীর মুখোশ পরিধান করেন এবং কাল ও লাল রঙের কাপড়ের বিশেষ ভাবে তৈরী পাজামা ও জামা পরিধান করেন। যা কালীকে উপস্থাপন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এখানে আমরা দেখতে পাই যে পুরুষ চরিত্র নারী কালীকে উপস্থাপন করেন তাতে ভিন্নমুখী শক্তির একত্রীকরণ ঘটে। ফলে সার্বিক ঐক্যের সৃষ্টি হয়। আর দুটি ভিন্নমুখী শক্তির যখন একত্রীকরণ ঘটে তখনি মহান শিল্পকর্মের উদ্ভব ঘটে। স্বতঃস্ফূর্ততা এবং শৃঙ্খলার সর্বোত্তম প্রকাশ আমরা কালীকাছের মধ্যে দিয়ে উপভোগ করি।

এখানে আমরা যে নারীকে দেখতে পাই তিনি হচ্ছেন দুষ্টের দমনকারী ও শিষ্টের পালকারী। তিনি অশুভ শক্তির বিনাশ সাধন করে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করেন। কালিকাছ প্রসঙ্গে চক্রবর্তী (২০০৮) বলেন,

> পূজারীবৃন্দের মতে, গৌরী দেহত্যাগের পর কালীরূপে আবির্ভূত হন। গৌরী দিব্যলোকে দেখতে পান পৃথিবীতে অসুরের উৎপীড়ন, অনাচার বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই তিনি পাপাচারকে দমন করার জন্য কালীরূপে আবির্ভূত হয়ে

অশুভ ধ্বংসে লিপ্ত হন। কালীশক্তি এ ধ্বংসযজ্ঞে দুটি লিঙ্গ ধারণ করেন। যথা : পুরুষকালী ও নারীকালী; পূজারীবৃন্দ আঞ্চলিক ভাষায় বলেন, ব্যাটা কালী ও বেটি কালী। তাণ্ডবলীলা- উন্মত্ত কালীর নারীরূপ হঠাৎ তার পদতলে স্বামী মহাদেবকে দেখতে পান, দেখে গ্লানিতে মূর্ছা যান এবং জিহ্বাতে কামড় বসান (পৃ:১২৯-১৩০)।

কালীকাছ ও মহিষাসুর বধে আমরা যে নারীর প্রতিরূপায়ণ দেখতে পাই সেখানে দুর্গা ও কালী মানবের কল্যাণে অশুভ শক্তির বিনাশকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। বাংলাদেশের মানিকগঞ্জ ও টাঙ্গাইল অঞ্চলে প্রচলিত শিব গৌরীর নৃত্যে যে নারীর উপস্থিতি দেখা যায় সেখানেও নারীচরিত্র পুরুষ অভিনেতাদের দ্বারা উপস্থাপিত হয়। কিন্তু উপর্যুক্ত সাংস্কৃতিক উপাদানগুলোতে যে নারীদেরকে উপস্থাপন করা হয় সেখানে অভিনেতারা তাদের লিঙ্গভিত্তিক আচরণে অধিক পরিমাণে অতিমাত্রা যুক্ত করেন না। তাদের আচরণে কদর্যতাও প্রকাশিত হয় না। এর পরিবর্তে উপস্থাপিত নারীর মধ্যে তাণ্ডব ও কোমলতার উপস্থিতি অধিক পরিমাণে লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ ঘাটু গান এবং কালিকাছে নারী চরিত্র উপস্থাপনে পুরুষ অভিনেতাদের অংশগ্রহণ ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও সামাজিক পরিস্থিতিকে তুলে ধরে।

৪.৩ মহিষাসুরবধ:

মহিষাসুরবধে আমরা যে নারীকে দেখতে পাই — সে নারী, দেবী। মহিষাসুরবধে দেবী দুর্গা ও অসুর আসরে বাদ্যের তালে তালে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে প্রবেশ করে। দুর্গা ও অসুর এর মধ্যে তাল ও লয়ের বিভিন্ন পার্থক্যের মধ্যে দিয়ে তুমুল যুদ্ধের পর দুর্গার নিকট অসুর পরাজয় বরণ করে। এরপর অসুর- কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও সিংহ পরিবেষ্ঠিত দুর্গার পদতলে পতিত হয়। দুর্গার প্রতি পূজার উপকরণ ও নৈবদ্য নিবেদনের মধ্যে দিয়েই কৃত্যমূলক এই পরিবেশনাটির সমাপ্তি ঘটে। বাংলাদেশের মানিকগঞ্জ অঞ্চলে বসবাসরত হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মাঝে চৈত্রসংক্রান্তি উপলক্ষে উপরে আলোচ্য অংশের আলোকেই মহিষাসুরবধ পালা পরিবেশিত হয়।

চিত্র-৯ : মহিষাসুর বধ, মানিকগঞ্জ। ছবি: মেহেদী তানজির

অপরদিকে মহিষাসুরবধ প্রসঙ্গে জাকারিয়া (২০০৮) বলেন,

> আনুমানিক দ্বাদশ শতাব্দী থেকে বাংলাদেশের বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনা, সুসংদুর্গাপুর, ধোবাউরা, কলমাকান্দা, হালুয়াঘাট, নলিতাবারি এবং বৃহত্তর সিলেট জেলার সুনামগঞ্জে হাজং জনগোষ্ঠী বসবাস করে আসছে। এদেশে বসবাসরত অনান্য জনগোষ্ঠীর মত হাজংরা নিজেদের বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব, কৃত্যাচার ও ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে বিভিন্ন ধরনের গীতি, নৃত্য, বাদ্য এবং নাট্যপালা পরিবেশন করে থাকে। প্রতিবছর বাংলা আশ্বিন ও কার্তিক মাসে চরমাগা বা নবান্ন উৎসবে এদেশের হাজংরা শ্যামা পূজার আয়োজন করে থাকেন। এ সময় হাজং যুবকরা একটানা সাত দিন ধরে গ্রামের বিভিন্ন বাড়ি ঘুরে মুখোশ নৃত্যসহ দেবতার বন্দনামূলক গীতি পরিবেশন করে থাকে। হাজং জনগোষ্ঠীর কিছু নৃত্য দল রয়েছে যারা এধরনের চরমাগা বা নবান্ন উৎসবে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে

পরিভ্রমণের কালে ধর্মীয় আখ্যানমূলক নৃত্যগীতের অংশ হিসেবে মহিষাসুরবধ ও দেবাসুরবধ পালার অভিনয় করে থাকে। এছাড়া, বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালন বা কোন ধরনের আমন্ত্রিত অনুষ্ঠানে বছরের যে কোনো সময়েই এই পালা পরিবেশিত হয়ে থাকে (পৃ:২৭৪)।

মঞ্চ বা আসর:

মহিষাসুরবধ পালায় আলাদা করে কোন মঞ্চ প্রস্তুত করা হয় না। বাড়ির উঠান বা কোন বড় মাঠের মধ্যে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। সংপালার মত করেই দর্শকেরা গোলাকার হয়ে আসরের বা মঞ্চের চারদিকে খড়কুটা বা বিচালি বিছিয়ে বসে উপভোগ করেন। আবার কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বর্গাকার বা আয়তাকার স্থান নির্দেশ করে তার চার কোণে চারটি বাঁশের খুঁটি পুতে তার উপর শামিয়ানা বা টিনের আচ্ছাদন দিয়ে মঞ্চ তৈরি করা হয়। তবে মঞ্চের আকার ও আকৃতি যেমনটাই হোক না কেন, দর্শকেরা এর চারদিকে বসেই অভিনয় উপভোগ করে থাকেন।

হাজংদের উপস্থাপিত মহিষাসুরবধ পালাটি সংলাপাত্মক। অপরদিকে মানিকগঞ্জ অঞ্চলে প্রচলিত মহিষাসুরবধ পালায় সংলাপের পরিবর্তে শুধু নৃত্য নির্ভর হিসেবে দেখতে পাই। মহিষাসুরবধ পালায় পুরুষ কুশীলববৃন্দ নারীচরিত্র উপস্থান করে থাকেন। দুর্গা চরিত্র উপস্থাপনকারী দুর্গার মুখোশ এবং নারীর বেশ-ভুশা গ্রহণ করেন। অপরদিকে অসুর চরিত্র রূপদানকারী অভিনেতা মুখোশের পরিবর্তে মুখে রঙ মেখে অংশগ্রহণ করেন।

আমরা শত চেষ্টা করলেও লোকজ সংস্কৃতির সাথে বাঙালির যে প্রাণের বন্ধন রয়েছে তা ছিন্ন করা যাবে না। তাই বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায়ও কোন ভাবেই আমাদের লোক আচার আচরণ থেকে বের হয়ে আসা সম্ভব নয়। আমাদের প্রাতহ্যিক জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে লোকজ বিশ্বাস তথা লোকজ সংস্কৃতি। লোকবিশ্বাসের ব্যাপকতা ও এর মাত্রা প্রসঙ্গে আহমেদ (২০০৭) বলেন,

> কুশপুত্তলিকা (Effigy) দাহ বিশ্বের একটি সর্বজনীন ব্যাপার (Phenomenon)। ধর্মীয়-সামাজিক-রাজনৈতিক কারণে কারও প্রতি বিরাগভাজন হলে বাঁশ-খড়-কাপড়-দড়ি দিয়ে তার প্রতিকৃতি তৈরি করে প্রকাশ্যে পোড়ানো হয়। উদ্দেশ্য ঐ ব্যক্তিকে অপমান করা। অতীতে কুশপুত্তলিকা সম্পূর্ণ জাদুর বিষয় ছিল। শত্রুর প্রতিকৃতি তৈরি করে মন্ত্র পাঠ করে তার গায়ে আঘাত করা হতো, তাতে ঐ ব্যক্তির শরীরে প্রতিঘাতের সৃষ্টি হতো। আঘাতের মাত্রা অনুযায়ী সে কষ্ট ভোগ, এমনকি মৃত্যুও বরণ করত(পৃ:৪৪)।

আমাদের একেকটি সমাজব্যবস্থায় ফোকলোরের উৎপত্তি একেক রকম। এ প্রসঙ্গে ইসলাম (১৯৬৭) বলেন, কৃষিনির্ভর সমাজের ফোকলোরের স্রষ্টা কৃষক অথবা জমিতে কর্মরত মজুর এবং এদের চারপাশের অনান্য মেহনতী মানুষ। অন্যদিকে

শিল্পায়িত সমাজের ফোকলোরের স্রষ্টা কলকারখানায় কর্মরত মেহনতি মজুর — মজুরের চারপাশের অর্থ আহরণে সুপটু বণিক এবং ধনিক শ্রেণী। শিল্পায়িত সমাজের ফোকলোরে যে সমরনায়ক ও বীর পুরুষের আবির্ভাব ঘটে তাঁরা মিল মালিকের বা ধনিক ও শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে সোচ্চার — এরা মেহনতি মানুষের প্রতিবাদ মুখর চেতনার প্রতীক। এঁদের ফোকলোরে চিমনীর ধোঁয়ার গন্ধ, বয়লারের উত্তাপ, কয়লার স্পর্শ আছে, আছে পরিশ্রমের মূল্য না পাওয়ার ও আর্থিক বঞ্চনার গ্লানি, আছে শ্রমজাত জীবনের করুণ পরিণতি, আছে বন্ধনাবদ্ধ প্রমিথিউসের শিকল ছেঁড়ার অদম্য তৃষ্ণা, আছে জীবন-বৈচিত্রের সন্ধান আর তার সাথে মুখব্যাদানকারী শূন্যতার হাহাকার। অপরদিকে কৃষিনির্ভর সমাজের ফোকলোরে আছে প্রকৃতির উপর নির্ভরতার চিত্র, আছে বৈচিত্রহীন জীবনের একঘেয়েমী, আছে মাঠের সুর এবং ঘাটের ব্যাঞ্জনা, আছে পাশুপাখির নিবিড় সান্নিধ্য (পশুপাখিও মানুষের ন্যায় কথা বলে ও আচরণ করে), আছে আদিভৌতিক ও অলৌকিক বিশ্বাসের ছড়াছড়ি, আছে অলস চিন্তার ও আষাঢ়ে গল্প (Tall Tales) রচনার প্রবণতা, অর্থাৎ সবকিছু মিলিয়ে একটি নিস্তরঙ্গ অথচ কামনা, বাসনা ও কল্পনাসিক্ত জীবনের প্রতিচ্ছবি (পৃ:৪১৯-৪২০)।

পঞ্চম অধ্যায়

বিদেশী সাংস্কৃতিক উপস্থাপনার (পারফরমেন্স) সঙ্গে ঘাটু গানের তুলনা

৫.১ বাচ্চাবাজী

৫.২ মেইল ডান

৫.৩ আন্নাগাতা

৫.৩ ভারতীয় খেয়াল

৫.১ আফগানিস্তানের বাচ্চাবাজি

অতি প্রাচীনকাল থেকেই আফগানিস্তানে এক প্রচলিত বিকৃত শিশু (যৌন) নির্যাতনের সংস্কৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। আর এই উল্লিখিত শিশু যৌনাচার বাচ্চাবাজি নামে পরিচিত। বাচ্চাবাজি এর আক্ষরিক অর্থ করলে ইংরেজীতে বলতে হয় 'Boy Play' আর বাংলায় যাকে আমরা বাচ্চা বাজি হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারি। হোরাস (২০১০) বলেন,

> "১০-১৫ বছর বয়সী বাচ্চা ছেলেদের মেয়েদের পোশাক পরিয়ে তাদেরকে দিয়ে নাচ- গানের মাধ্যমে মনোরঞ্জনের শেষে বিকৃত যৌন আনন্দের জন্য যখন ব্যবহার করা হয় তখন তাকে 'বাচ্চা বাজি' বলে"(প্যারা-১)।

চিত্র-১১ : বাচ্চাবাজি, আফগানিস্থান। ছবি: সংগৃহীত

এখানে আমরা স্পষ্টতই দেখতে পাই যে কিশোর ছেলেদের মাঝে নারী সৌন্দর্যের সন্ধানের মধ্যে দিয়ে আযাচিত যৌনাচারে লিপ্ত হওয়া। যা আমাদের দেশের ঘাটু গানের প্রেক্ষাপটের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পিবিএস নেটওয়ার্কের ফ্রন্টলাইন অনুষ্ঠানে আফগানিস্তানের এই অতি প্রাচীন কাল থেকে চলে আসা প্রথাটির উপর একটি ডকুমেন্টারি প্রচার করে। ডকুমেন্টারিটির নাম দেওয়া হয়েছিল "The dancing boys of Afghanistan".

আমাদের দেশে প্রচলিত ঘাটু গানের মতই টাকার বিনিময়ে কিনে নেয়া এই ছেলেগুলোর নতুন মনিব (Master) নিয়ন্ত্রণ করে এদের জীবনের সবকিছুই। এরকম একজন মনিবের আস্হা অর্জন করে তার সাথে ঘুরে ঘুরে নাজিবুল্লাহ কোরায়শী আফগানিস্তানের অন্ধকারতম একটি জগতের স্বরূপ তুলে ধরেছেন। তথ্যচিত্রটির আলোকে আমরা দেখতে পাই দস্তগীর

হলো এরকমই একজন 'বাচ্চাবাজি'র মনিব যে কিনা একজন প্রাক্তন মুজাহিদীন কমান্ডার। তিনি দিনের বেলায় গাড়ি ব্যবসায়ী। কিন্তু রাতের বেলায় সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রজাতির এক অন্য মানুষ।

চিত্র- ১২ : দস্তগির, প্রাক্তন মুজাহিদীন কমান্ডার, আফগানিস্তান। ছবি: সংগৃহীত

আর এই দস্তগীরের আস্হা অর্জন করেই নজিবুল্লাহ কোরায়শী বের করে এনেছেন এই অন্ধকার জগতের অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য। তুলে ধরেছেন কিভাবে প্রভাবশালী ওয়ার লর্ডরা একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মালিক হয় এইসব ছেলেদের এবং তাদের বাধ্য করে অমানবিক এবং অনৈতিক সব কার্যকলাপে। তথ্যচিত্রটির ধারাবাহিকতায় আমরা দেখতে পাই, মিস্তরী হলো একজন প্রাক্তন সিনিয়র কমান্ডার যার সাথে প্রধান প্রধান সব ওয়ার লর্ডদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। তার নিজের ভাষ্যমতে সে নিজেও এরকম একটি ছেলের মনিব ছিলো। কারণ প্রত্যেক কমান্ডারই একজন পার্টনার ছিলো। অনেক ছেলেই বিভিন্ন সময় পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে কিন্তু তাদের সে চেষ্টার পরিণতি যে খুব একটা ভালো হয়নি সেটা আর বলে দেবার অপেক্ষা রাখে না। "The dancing boys of Afghanistan" নামের পিবিএসের আলোচ্য অনুষ্ঠানটি শফিক (ছদ্ম নাম) নামের একটি ১১ বছরের বাচ্চাকে কেন্দ্র করে করা হয়।

চিত্র-১৩ : শফিক ও ইমরান। ছবি: সংগৃহ

৫.২ চীনের মেইল ডান

ঐতিহ্যবাহী চাইনিজ থিয়েটারেও আমরা নারী চরিত্র উপস্থাপনে পুরুষের অংশগ্রহণ দেখতে পাই। চাইনিজ থিয়েটারে নারীর প্রসঙ্গে Jiao (as cited in Tian, 2000) বলেন,

> "…in the Han dynasty there were male players impersonating *jinu* (female singers and dancers), a custom that ushered in the convention of female impersonation later called *zhuang dan"* (p: 79).

এর পাশাপাশি Wang (as cited in Tian, 2000) বলেন,

> "Emperor Xuan Di (r. 578-579) of the North Zhou dynasty (557-581) ordered handsome young men of the city, dressed as women, to sing and dance inside the imperial court for the Emperor and his company" (p: 79).

চাইনিজ মেল ডানের জন্য যে সব বালকদের ব্যবহার করা হত তাদের দেখতে সুন্দর ও স্বভাব চরিত্রের মধ্যে মেয়েলি স্বভাব খোঁজা হত। এ প্রসঙ্গে Tang (as cited in Tian, 2000) বলেন,

> Although antitheatrical sentiments tend to exaggerate the sexual associations of female impersonation, sexual appeal is inherent in the art of female impersonation. Certainly the boy *dan (chu lin)* were selected for their feminine physical features and voice quality. …Biographical data indicate unmistakably that boys were selected and trained as *dan* for their charming facial features, slender figures, and feminine voices. (p: 82)

ঘাটু গানের ক্ষেত্রেও এরকম বালকদের প্রাধান্য দেয়া হত। তারপর বিভিন্নভাবে মহড়ার মধ্যে দিয়ে নাচ-গানে পারদর্শী করে তোলা হত৷ এর পর দেখা যেত যে দলের এক বা একাধিক সদস্য ঘাটু বালকের সাথে অভিনয় বহির্ভূত যৌনসম্পর্কে লিপ্ত হত। মেল ডানেও আমরা এমনটা দেখতে পাই। Wang (as cited in Tian, 2000) বলেন,

> …many young male *dan* in Beijing were well known for their homosexual appeal. He mentioned in particular that one of them, who was pretty through not a very good singer or actor, could mesmerize audiences with his natural beauty alone.

...the appreciation of *xianggu* was tied to the experience of homosexual erotic pleasures. (p: 83)

৫.৩ জাপানি আন্নাগাতা :

জাপানি কাবুকি ও নো নাটকে যে নারীচরিত্রের উপস্থাপন দেখা যায় সেখানে আমদের দক্ষিণ এশিয়ার লোকনাট্যধর্মী অভিনয় পদ্ধতি অর্থাৎ নারীচরিত্র উপস্থাপনে পুরুষেরা অংশগ্রহণ করেন। নো ও কাবুকি মূলত বুদ্ধেরই আরাধনামূলক প্রার্থনাসূচক নাট্যপ্রক্রিয়া। নো এবং কাবুকি দুটোই গীতি নাট্যধর্মী বর্ণনাত্বক ধীরগতি সম্পন্ন নাটক। নো নাটকে মৃত ব্যক্তির অতৃপ্ত আত্মার চরিত্রাভিনয় উপস্থাপিত হয় এবং তাদের অতৃপ্তির কারণ ব্যাখা করেন। তাদের সীমাহীন দুঃখের বর্ণনা শেষ পর্যন্ত নির্বাণাকাঙ্ক্ষায় গিয়ে পৌঁছায়। তবে নো ও কাবুকিতে গল্প বলা বা অভিনয়ের থেকে নৃত্যই মুখ্য হয়ে ওঠে। 'নোহ' অর্থ শক্তি, যা প্রকৃত অর্থেই ধর্মের শক্তি। কাবুকি নাট্যও ধর্মীয় প্রভাবযুক্ত। তবে নো নাটকের চেয়ে কাবুকিতে নাট্যময়তা ও প্রদর্শনময়তা অধিক পরিলক্ষিত হয়। কাবুকিতে সাধারণত সমর কাহিনী ও প্রাত্যহিক মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বকে তুলে ধরা হয়। জাপানি নাটকে নারী চরিত্র উপস্থাপনে অংশগ্রহণকারীরা আন্নাগাতা নামে পরিচিত। যাঁরা অভিনয় জীবনের বাইরেও বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে নারীদের অনুকরণ ও নারীদের মত করে জীবন ধারণ করে থাকেন।

ছবি: সংগৃহীত

জাপানের নো এবং কাবুকিতে নারী চরিত্র উপস্থাপনে পুরুষের অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে Tian (2000) বলেন,

> It is worth noting that identification is not only central to the performance of the Chinese male *dan*, but also to the art of female impersonation in *no* and *kabuki,* which is characterized by the same degree of stylization and codification as its Chinese counterpart. (p: 84-85)

বিশ্বকোষের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, ধ্রুপদী নাট্যধারা জাপানী কাবুকির সাধারণের রঙ্গালয় হিসেবে যাত্রা শুরু হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে। কাবুকিতে নো- নৃত্য ও পুতুল নাচের প্রভাব দেখা যায়। এই নাট্য ধারার আবিষ্কর্তা একজন মহিলা হলেও পরবর্তীতে নারী ও তরুণদের অভিনয় নিষিদ্ধ করা হয়। কাবুকি নাটকের ইতিহাস পর্যালোচনা করে জানা যায় যে, ১৬০৩ সালে ইজুমো নো ওকুনি শুথনো নদীথাতে বিশেষ এক ধরনের নৃত্য নাট্যের সূচনা করলেন। এই নাটকের সমস্ত অভিনয় মহিলারাই করতো। এই মহিলা কাবুকিদের আন্না কাবুকি বলা হতো। সেটা ছিল মহিলা কাবুকির যুগ (১৬০৩-১৬২৯)। অতিদ্রুত তা জনপ্রিয়তার শিখরে পৌঁছে গেল এবং কাবুকি তার সহজাত পথ ভুলে নিছক বিনোদনের পথে পা বাড়ালো। আর নাটকের অভিনেত্রীরা সহজেই যৌন পেশায় পা বাড়াল। তাই এ সময় কাবুকি নাট্যধারাকে বারাঙ্গনাদের নৃত্যসঙ্গীত বলা হতে থাকল। জাপানের সংস্কৃতির সাথে এই পরিবর্তিত কাবুকির সংস্কৃতি মিশে গিয়ে সামাজিক অবক্ষয়ের সৃষ্টি হলে তৎকালীন শোগুন শাসক ১৬২৯ সালে মহিলা কাবুকি বা আন্না-কাবুকিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। আন্না-কাবুকিকে অনুসরণ করে জাপানের এক দল তরুণ ওয়াকাসু কাবুকি শুরু করেন, কিন্তু এরাও যৌন কর্মে লিপ্ত হওয়ায় শোগুন শাসক আন্না-কাবুকির মত ওয়াকাসু কাবুকিও নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ফলে সঙ্গত কারণেই সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি কাবুকি নাট্যধারা প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষদের হাতে গিয়ে পড়ে। প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষদের দ্বারা অভিনীত কাবুকিকে বলা হত ইয়ারো-কাবুকি। ইয়ারো কাবুকিদের মধ্যে যারা মহিলা চরিত্রে অভিনয় করতো তাদেরকে বলা হতো 'আন্নাগাতা'। নারী বর্জিত এই নাট্যধারা বেশ ভালই চলছিল, কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় বেশ কিছু দিন পরে। আন্নাগাতারা নারী চরিত্রে অভিনয় করতে করতে নিজেদের মধ্যে নারী সুলভ আচরণ দৈনন্দিন জীবনেও লালন করতো। তাই নারী-পুরুষ উভয় শ্রেণীর কাছেই তারা যৌনকর্মী হিসেবে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠত। ফলে শোগুন প্রশাসন আন্নাগাতা ওয়াকাসু কাবুকিদের নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। অবশ্য ১৬৫২ সালেরও আরও কিছু সময় পরে এদের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

জাপানি সংস্কৃতির দার্শনিকতার ব্যাখ্যায় 'নো' নাটকের ভূমিকা অপরিসীম। নো নাটক মূলত মুখোশ, সঙ্গীত এবং অভিনয়ের সমন্বয়ে অতিরঞ্জিত শৈলীর নাটক। সমস্ত নো নাটকেই মূল অভিনেতাকে বলা হয় শিটে এবং কম গুরুত্বপূর্ণ দ্বিতীয় অভিনেতাকে বলা হয় ওয়াকি। ওয়াকির ভূমিকা হলো মূল অভিনেতাকে অর্থাৎ শিটেকে মঞ্চে আহ্বান করা, তাকে প্রশ্ন করা এবং নাচার জন্য প্রণোদনা প্রদান করা। সূচনা পর্ব থেকেই নো নাটক লেখার দায়িত্ব পালন করেন নো নাটকের অভিনেতারা নিজেরাই। তাই নো নাটকের বিষয়বস্তু ও নাটকীয়তার মধ্যে আমরা অনেক সরলতার প্রতিফলন দেখতে পাই। হাই (২০১৬) বলেন, নো থিয়েটারের বিষয় এবং নাটকীয়তা বেশ সরল। বিশেষ দৃশ্য, নাটকের গঠন কাঠামো, নাচ এবং সঙ্গীতের সাহায্যে একটি আবেগের ক্রমাগত উঁচু মাত্রায় আরোহণ উপস্থাপন করা হয়। নাচ ও কাহিনী নো নাটকের

অন্তর্ভুক্ত হলেও সব নাটকে এগুলো থাকে না। গান ও সঙ্গীত ধ্বনিই নো নাটকের প্রধান উপাদান। নো নাটকের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে পিতৃস্নেহ, ভলবাসা, ঈর্ষা, প্রতিহিংসা এবং সামুরাই যোদ্ধাদের চেতনা। নো নাটকের স্ক্রিপ্টে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভারসাম্যের অভাব দেখা যায় এবং কাহিনী কিছুটা অবিন্যস্ত মনে হয়। কাহিনী প্রধান নাটকের ফর্ম বা দৃশ্যের পর দৃশ্য সাজিয়ে কাহিনী বর্ণনা করা হয় না নো নাটকে। একটি বিশেষ মুহূর্তকে নির্বাচিত করে তার শিল্পসুলভ ও সৌন্দর্যময় উপস্থাপনাই এর উদ্দেশ্য। এ কারণেই এ নাটকে শব্দ, কথা, সঙ্গীত এবং নাচের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয়। (পৃ: অনুল্লেখিত)

৫.৪ ভারতীয় খেয়ালসহ প্রভৃতি উপাদানে নারীর অবস্থান:

খেয়াল শব্দটি মূলত আরবি ও ফারসি ভাষা থেকে উদ্ভুত হলেও ভারতীয় সঙ্গীতের প্রধানতম শৈলীগুলোর মধ্যেকার অন্যতম প্রধান শৈলী হচ্ছে এই খেয়াল। ধ্রুপদ গানের কাঠামকে আশ্রয় করেই এর উৎপত্তি ঘটে। ভারতীয় খেয়ালেও আমরা দেখতে পাই যে সেখানে নারী চরিত্র পুরুষ কুশীলববৃন্দের দ্বারা উপস্থাপন করা হয়। ভারতীয় খেয়ালে নারী চরিত্রের উপস্থাপন ও অন্যান্য চরিত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে অল্ট (১৯৯১) বলেন,

> ⋯all *khyal* performers are male. ⋯ all major roles fall into five types: Halkara (friend or vassal of the king), Dasi (young girl or servant girl), King, Queen, and the Joker or Clown. The first two types are supporting roles; the later three are principals. (p: 144)

ভারতীয় খেয়ালে আমরা যে নারী চরিত্র উপস্থাপনে পুরুষের অংশগ্রহণ দেখতে পাই- তার প্রেক্ষাপট চাইনিজ মেইল ডান, জাপানি আন্নাগাতা বা আফগানিস্থানের বাচ্চাবাজির মত নয়। খেয়াল ব্যতিত অনান্য উপাদানগুলোতে নারী চরিত্র উপস্থাপনে পুরুষ কুশীলবদের সাথে যৌনতার সম্পর্ক রয়েছে। যা আমাদের দেশের ঘাটু গানের শিল্পীদের সাথে সম্পৃক্ত। আমাদের দেশের ঘাটু গানে যে কিশোরেরা ঘাটু সেজে নাচ গান করতে বাধ্য হতো এর সাথে আফগানিস্থানের বাচ্চাবাজিতে ব্যবহৃত কিশোরদের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটের হুবুহু মিল পাওয়া যায়। এরা প্রত্যেকেই তাদের জীবিকার তাগিদে নিজেদের ইচ্ছায় বা পরিবারের চাপে এই পেশায় যেতে বা অংশগ্রহণ করতে বাধ্য হয়। উপরে আলোচ্য উপাদানগুলির সাথে যৌনতার সম্পর্ক থাকলেও উক্ত উপাদানগুলি নিজস্ব শিল্প আঙ্গিক হিসেবে বিশ্বদরবারে (বিশেষ করে কাবুকি ও নো) অত্যন্ত সুনামের সাথে টিকে আছে। আমাদের জাতি হিসেবে ব্যর্থতা এটাই যে, যৌনতার অপবাদ দিয়ে আমরা ঘাটু গানকে সমাজের সাধারণ শ্রেণি-পেশার মানুষের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছি। অন্যান্য দেশের মত করে আমরা এটাকে শিল্পের আসনে এর পোক্ত অবস্থান সৃষ্টি করতে পারি নি। যেটা জাতি হিসেবে আমদের জন্য অত্যন্ত বেদনা, অপমান ও কষ্টের।

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপস্থাপনার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

৬.১ তাত্ত্বিক আলোচনা

৬.২ প্রশ্নপত্র অনুসারে তথ্য বিশ্লেষণ

৬.৩ চরিত্র উপস্থাপনে সাংস্কৃতিক কৌশল

৬.৪ উপস্থাপনা কৌশল ও সামাজিক মূল্যায়ন

৬.১ তাত্ত্বিক আলোচনা:

আমাদের একেকটি সমাজ ব্যবস্থায় ফোকলোরের উৎপত্তি একেক রকম। এ প্রসঙ্গে ইসলাম (১৯৬৭) বলেন, কৃষিনির্ভর সমাজের ফোকলোরের স্রষ্টা কৃষক অথবা জমিতে কর্মরত মজুর এবং এদের চারপাশের অনান্য মেহনতী মানুষ৷ অন্যদিকে শিল্পায়িত সমাজের ফোকলোরের স্রষ্টা কলকারখানায় কর্মরত মেহনতী মজুর- মজুরের চারপাশের অর্থ আহরণে সুপটু বণিক এবং ধনিক শ্রেণী৷ শিল্পায়িত সমাজের ফোকলোরে যে সমরনায়ক ও বীর পুরুষের আবির্ভাব ঘটে তাঁরা মিল মালিকের বা ধনিক ও শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে সোচ্চার- এরা মেহনতী মানুষের প্রতিবাদ মুখর চেতনার প্রতীক। এঁদের ফোকলোরে চিমনীর ধোঁয়ার গন্ধ, বয়লারের উত্তাপ, কয়লার স্পর্শ আছে, আছে পরিশ্রমের মূল্য না পাওয়ার ও আর্থিক বঞ্চনার গ্লানি, আছে শ্রমজাত জীবনের করুণ পরিণতি, আছে বন্ধনাবদ্ধ প্রমিথিউসের শিকল ছেঁড়ার অদম্য তৃষ্ণা, আছে জীবন বৈচিত্রের সন্ধান আর তার সাথে মুখব্যাদানকারী শুন্যতার হাহাকার। অপরদিকে কৃষিনির্ভর সমাজের ফোকলোরে আছে প্রকৃতির উপর নির্ভরতার চিত্র, আছে বৈচিত্রহীন জীবনের একঘেয়েমী, আছে মাঠের সুর এবং ঘাটের ব্যাঞ্জনা, আছে পাশুপাখির নিবিড় সান্নিধ্য (পশুপাখীও মানুষের ন্যায় কথা বলে ও আচরণ করে), আছে আদিভৌতিক ও অলৌকিক বিশ্বাসের ছড়াছড়ি, আছে অলস চিন্তার ও আষাঢ়ে গল্প (Tall Tales) রচনার প্রবণতা, অর্থাৎ সবকিছু মিলিয়ে একটি নিস্তরঙ্গ অথচ কামনা, বাসনা ও কল্পনাসিক্ত জীবনের প্রতিচ্ছবি (পৃ:৪১৯-৪২০)।

সংযাত্রা, কালীকাছ, মহিষাসুর বধ, বাইদ্যানিরগান, শিব গৌরীর নাচসহ অন্যান্য লোকজ সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানে আমারা নারীদের উপস্থিতি দেখতে পাই। কালীকাছ, মহিষাসুর বধ ও শিব-গৌরীর নাচ সাধারণত ধর্মীয় প্রার্থনার অংশ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। এখানে অভিনয়ে অংশগ্রহণকারীরা নিজেকে ছাপিয়ে দেবত্বের পর্যায়ে উপনীত হন। সর্বোপরি উপর্যুক্ত সাংস্কৃতিক উপাদানে পুরুষের নারী হিসেবে অংশগ্রহণ আর ঘাটু গানে নারী হিসেবে পুরুষের অংশগ্রহণ এক কথা নয়। ঘাটু গানে আমরা দেখতে পাই যে অনেক ক্ষেত্রে ঘাটু ছেলের সাথে দলের অধিকর্তা বা অন্যান্য অভিনেতাদের সাথে অভিনয় বহির্ভূত সম্পর্ক থাকতো। সমাজের সব মানুষ একে ভাল চোখে দেখত না। ফলে অনেক মানুষের নিকট এর গ্রহণযোগ্যতা অস্পৃশ্যতার পর্যায়ে পৌঁছেছিল। তাই যাঁদের অস্থিমজ্জায় মিশে আছে এই গান তারাও আজ সমাজের লোক-চক্ষুর ভয়ে নিজেদেরকে এ গান থেকে গুটিয়ে নিচ্ছেন। যদিও তারা অভিনয় বহির্ভূত অন্য সম্পর্কের সাথে যুক্ত নন। ঘাটু গানে যারা রাধা ও কৃষ্ণের ভূমিকায় অভিনয় করেন তাদের কথা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে ঘাটু গানের শিল্পী আব্দুর রশিদ খান সুকন (যিনি রাধার ভূমিকা পালন করেন) এর প্রসঙ্গ টেনে জাকারিয়া (২০১৩) বলেন,

> আমি তো একজন পুরুষ, আমার সংসার আছে, সন্তান আছে। ঘাটু গানের আসরে আমি নারী সেজে ঘাটুর পাট করি। এলাকার মানুষ এটাকে স্বভাবিকভাবে নেয় না, করলে অনেকেই টিটকারি দেয়। কিন্তু এই ঘাটু গানকে আমি ভালবাসি। এলাকার মানুষের মধ্যে এই গান নিয়ে যদি ভাল কোন ধারণা না আসে, তো আমার মনে হয় এই গান আমার পর আর কেউ করবে কি না, সন্দেহ আছে। (পৃ: ৪)

আমরা পিতৃতন্ত্রের আলোকে দেখতে পাই যে সমাজের পুরুষেরা নারীদের চেয়ে অধিকতর ক্ষমতাশীল ও শক্তিশালী। ঠিক তেমনি ঘাটু গানেও দেখা যায় যে নারীরা পুরুষের নিকট আশ্রয় খুঁজে বেড়ায়। এ বিষয়ে নারীদের প্রসঙ্গে আজাদ (১৯৯২) বলেন,

> মনোবিশ্লেষকের কেউ কেউ বলেন নারী প্রেমিকের মধ্যে খোঁজে পিতাকে। আসলে তারা পিতা নয়, খোঁজে পুরুষকেই ; যে তাকে দিতে পারে মহিমা।...প্রেমিক যখন তাদেরকে ডাকে মিষ্টি মেয়ে, ময়না, আমার পাখি, তখন তা তাদের হৃদয় স্পর্শ করে। পুরুষের বাহুতে বালিকা হয়ে ওঠার আনন্দ তাদের অসীম। (পৃ: ১৯৯)

উপরের আলোচ্য উক্তিগুলোর মধ্যে দিয়ে আমরা দেখতে পাই কেট মিলেট এর যৌনবাদী রাজনীতি তত্ত্বের প্রতিফলন। যৌনবাদী রাজনীতির আলোকে কেট মিলেট আমাদের সমাজের পিতৃতন্ত্রকে খুব নিখুঁত ভাবে তুলে ধরেছেন। ঘাটু গানের মধ্যেও আমরা কেট মিলেটের যৌনবাদী রাজনীতির উপস্থাপন দেখতে পাই। সমাজে পিতৃতন্ত্র নিম্নোক্ত উপায়ের মধ্যে দিয়ে তার পুরুষালি আধিপত্যকে তুলে ধরে। যথা: ১. ভাবাদর্শগত, ২. শ্রেণীগত, ৩. জীববিজ্ঞান সংক্রান্ত, ৪. সমাজবিদ্যা বিষয়ক, ৫. অর্থনৈতিক, ৬.বল প্রয়োগ, ৭. নৃতাত্ত্বিক পুরাণ ও ধর্ম এবং ৮. মনস্তাত্ত্বিক।

উপরে আলোচ্য পুরুষালি আধিপত্যর ধারার প্রায় প্রত্যেকটিরই প্রকাশ ঘাটু গানের মধ্যে কোননা কোন ভাবে প্রতিফলিত হয়। ভাবাদর্শ গত জায়গা থেকে পিতৃতন্ত্র সম্মতি আদায়ের মধ্যে দিয়ে তার আধিপত্যকে তুলে ধরে। ঘাটু গানের অন্যতম চরিত্র রাই ও শ্যামের মধ্যে খুব সূক্ষ্মভাবে এর প্রভাব আমরা দেখতে পাই। এখানেও অত্যন্ত সুকৌশলে পিতৃতন্ত্রকে তুলে ধরা হয়।

বৃহত্তর সমাজের সাথে ব্যক্তির সংযোগ সৃষ্টি করে পরিবার। পরিবার হচ্ছে সমাজের দর্পণ। সামাজিক যে কোন আচারের ক্ষেত্রে পরিবার মূলাদর্শ হিসেবে কাজ করে। পরিবার ব্যক্তিকে বিভিন্ন জায়গায় খাপ খাইয়ে নিতে সাহায্য করে। আর পিতৃতন্ত্র দাবি করে যে পরিবার হচ্ছে বৈধ। এটা প্রতিষ্ঠিত হয় বিবাহ ও অন্যান্য প্রথার দ্বারা। পিতৃতন্ত্র ধর্ষণ, হাসি এবং ঠাট্টা- তামাশার দ্বারা বল প্রয়োগ করে থাকে। যার উপস্থিতি ঘাটু গানের সমসাময়িক বিষয়ের মধ্যে আমরা পাই। আরেক

ধরনের বল প্রয়োগ হয় বৈরিতামূলক হাসির মাধ্যেমে। এগুলোসহ পুরুষালি আধিপত্যের সবগুলোর উপস্থিতি প্রচ্ছন্নভাবে আমরা ঘাটু গানে দেখতে পাই। আজাদ (১৯৯২) বলেন,

> "পুরুষ ধরেই নেয় নারী যখন প্রেমে পড়ে, তখন সে ভুলে যায় তার অস্তিত্ব, তার সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব; কেননা প্রেমে পুরুষ ঈশ্বর আর নারী ভক্ত । ভক্ত যেমন নিজেকে সমর্পণ করে প্রভুর পদতলে, নারীও করে তাই; কেননা প্রভু ছাড়া নারী নিরস্তিত্ব'' (পৃ: ১৯৮)।

ঘাটুতেও উপস্থাপিত বিভিন্ন গানের মধ্যে আমরা এ বিষয়টির স্পষ্ট উল্লেখ দেখতে পাই। মানবসমাজে যৌনতা আবিষ্কারের ইতিহাস আমরা আদম ঈভের গল্পের মাধ্যেমে জানতে পারি। বিভিন্ন মিথের আলোকে ধর্মও নারীকে বঞ্চিত করেছে। আজাদ (১৯৯২)বলেন,

> সব ধর্মেই নারী অশুভ, দূষিত, কামদানবী। নারীর কাজ নিষ্পাপ স্বর্গীয় পুরুষদের পাপবিদ্ধ করা; এবং সব ধর্মেই নারী অসম্পূর্ণ মানুষ। নারী কামকূপ...সে নিজের রন্ধ্রটিকে একটি অক্ষত টাটকা সতিচ্ছদে মুড়ে তুলে দেবে পুরুষের হাতে। পুরুষ সেটি ইচ্ছে মত ভোগ করবে, নিজের জমি যেভাবে ইচ্ছে চষবে। (পৃ: ৬৫)

এই চিন্তার প্রভাব ঘাটু গানে পরিলক্ষিত হয়। অপরদিকে জুডিথ বাটলারের তত্ত্বের আলোকে আমরা দেখতে পাই যে, জেন্ডারের মধ্যে অভিকরণশীলতার বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। ঘাটু গানেও জেন্ডারের অভিকরণশীলতা বিদ্যমান। বাটলার তার তত্ত্বের আলোকে পুরুষকে পুরুষ এবং নারীকে নারী সুলভ আচরণে সীমাবদ্ধ থাকার বিরোধিতা করেছেন। তার মতে Performitivity শুধু কথায় নয়, দাঁড়ানো, পোশাক ও অঙ্গ-ভঙ্গিমাসহ যাবতীয় সব কিছু হচ্ছে জেন্ডার গত ভাষা। এর উপস্থিতি আমরা ঘাটুতে পাই।

বাটলারের তত্ত্বের আলোকে আমরা দেখতে পাই যে আমাদের শরীর যে অর্থ প্রকাশ করে তা Dramatic বা নাট্যিক। আমরা আমাদের শরীরটাকে প্রতিনিয়ত ক্রিয়াশীল করছি। আর এই ক্রিয়াশীলতা বা সৃষ্টিশীলতা Discourse দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। Performance হচ্ছে কর্তা কি বলে, কি করে এবং কি করার মাধ্যেমে কোন কিছু উপস্থাপন করে। অপরদিকে অমৌখিক ভাষা এবং অবাচনিক সকল প্রকাশক্ষম ক্রিয়ার রূপের অভিক্রিয়ার ক্ষমতাই হচ্ছে Performitivity বা অভিকরণশীলতা। ঘাটু গানের মধ্যেও আমরা দেখতে পাই যে অভিকরণশীলতা অভিনেতাদের অর্থাৎ রাই ও শ্যামের পরিচয় তুলে ধরে। অভিকরণশীলতা হচ্ছে আমাদের সমাজের প্রচলিত Discourse এর সেই পুনরাবৃত্তিমূলক ক্ষমতা যা ইন্দ্রিয়গোচর ঘটনা সৃষ্টি করে এবং আমাদেরকে ঐ Discourse এর আলোকে নিয়ন্ত্রণ ও বাধ্য করে। Gender, Sex এবং Sexuality

স্বেচ্ছাপ্রণোদিত পছন্দ নয়। কারণ Gender দ্বারা নির্মিত কর্তা নিয়মতান্ত্রিক Discourse এর বলয়ে আবদ্ধ। অর্থাৎ আমরা সব সময় সামাজিক কাঠামো দ্বারা পরিচালিত। আর এই ক্ষেত্রগুলোর আলোকে সামাজিক কাঠামোর প্রতিফলন ঘাটুতে বিভিন্ন গানের মধ্যে দিয়ে অভিনেতাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। ঘাটুতে রাই (চিত্র- ১) যেভাবে পোশাক-আশাক, সাজসজ্জা যেমন: কানের দুল, গয়না এবং পায়ে আলতা মাখেন তাতে আমরা জেন্ডার গত নারী সুলভ আচরণের প্রকাশ দেখতে পাই। অনেক ক্ষেত্রে এর ভিন্নতাও লক্ষ করা যায়। নারীর সাজসজ্জা নিয়ে আজাদ (২০০১) বলেন,

> সাজসজ্জার মধ্যে দিয়ে নারী নিজেকে প্রকৃতির সহচর করে তোলে এবং সে প্রকৃতির কাছে নিয়ে আসে ধূর্ততার আবশ্যক। পুরুষের কাছে সে হয়ে ওঠে পুষ্প ও রত্ন — একই সাথে নিজের কাছেও। পুরুষের উপর জলের প্রবাহিত তরঙ্গ, পশমের উষ্ণ কোমলতা ছড়ানোর আগে, সে নিজে উপভোগ করে সেগুলোকে। তার টুকিটাকি গয়নাগাটি, তার গালিচা কম্বল, তার গদি ও তার ফুলের তোড়ার সাথে তার সম্পর্ক অনেক কম অন্তরঙ্গ পালক, মুক্ত, বুটিদার রেশমি পোশাক ও রেশমের সাথে তার সম্পর্কের থেকে, যা সে মিশিয়ে দেয় তার মাংসের সাথে; ওগুলোর বর্নাঢ্যতা ও ওগুলোর কোমল বুনট ক্ষতিপূরণ করে কামের জগতের পুরুষতার, যা তার ভাগ্য; যত কম পরিতৃপ্ত হতে থাকে তার ইন্দ্রিয়ানুভূতি, সে ততবেশি মূল্য দিতে থাকে ওগুলোকে। (পৃ: ২৮৭)

ঘাটুতে উপস্থাপিত রাই চরিত্রের মধ্যে এর প্রকাশ দেখা যায়। ঘাটু গানের কথা ও নৃত্যের মধ্যে মাঠ পর্যায়ে কাজের ক্ষেত্রে আমরা রাই ও শ্যাম উভয় চরিত্রের মধ্যেই জেন্ডার এর অভিকরণশীলতার উপস্থিতি দেখতে পাই। আর তখন দেখা যায় যে তাদের মধ্যেকার নারী ও পুরুষসুলভ আচরণ সব সময় স্থিত নয়। মাঝে মাঝে শ্যামের মাঝে নারীসুলভ ও রাই এর মাঝে পুরুষসুলভ আচরণও পরিলক্ষিত হয়। প্রচলিত পিতৃতন্ত্রের আলোকে আমরা দেখতে পাই যে, আমাদের সমাজে নারীর থেকে পুরুষেরা অধিকতর সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। কিন্তু ঘাটু গানের ক্ষেত্রে পুরুষালী ও নারীসুলভ আচরণের আলোকে বলতে পারি যে — এ গানে উপস্থাপিত রাই শ্যামের থেকে অনেক সক্রিয়। নাচ ও গানের অনেক ক্ষেত্রেই শ্যামের থেকে রাই –এর ভূমিকা অগ্রগণ্য। অর্থাৎ ঘাটু গানেও জেন্ডারের ধারণা কোথাও স্থিত নয়। ঘাটু গানে উপস্থাপিত বিভিন্ন বিষয়াবলি ও চরিত্রগুলোর আলোকে আমরা দেখতে পাই জেন্ডার সম্পর্কিত জুডিথ বাটলারের দেয়া তত্ত্ব এখানে ক্রিয়াশীল। অর্থাৎ ঘাটু গানে জেন্ডার এর অভিকরণশীলতার বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

৬.২ প্রশ্নপত্র অনুসারে তথ্য বিশ্লেষণ:

ঘাটু গানের সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষপট শিরোনামে অভিসন্দর্ভ রচনার ক্ষেত্রে সমাজের নানা শ্রেণী-পেশার সাথে জড়িত মানুষের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছেন লোকশিল্পী, গবেষক ও প্রাবন্ধিক, সরকারী কর্মচারী, ব্যবসায়ী, ছাত্র, শিক্ষকসহ বিভিন্ন ধরনের শ্রমজীবী মানুষ। নিম্নে অভিসন্দর্ভ বিষয়ক প্রশ্নমালার আলোকে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী কতিপয় ব্যক্তিদের নামের তালিকা তুলে ধরা হল:

১. আব্দুল ওয়াদুদ মতিউর রহমান (মতি চাচা, ৭৫), পেশা: মুদির দোকানী। ২. মোঃ নুরুল ইসলাম (৬২), পেশা: গৃহস্ত। ৩. প্রদীপ কুমার পণ্ডিত (৪৪), পেশা: সঙ্গীত শিল্পী বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশন। ৪. সুসেন চন্দ্র সাহা রায় (৪৩), পেশা: শিক্ষকতা। ৬. গীতিকার মোঃ ফজলুর রহমান (৬৬), পেশা: গান রচনা করা। ৭. লুৎফর হায়দার খান (৪২), পেশা: আইন ব্যবসা। ৮. মোঃ আশরাফুল ইসলাম (২২), পেশা: ছাত্র। ৯. সত্যেন্দ্র চন্দ্র দাস (৬৫), পেশা: অবসর প্রাপ্ত সরকারী চাকরিজীবী। ১০. আমিনুর রহমান সুলতান (৪৮), পেশা: উপ-পরিচালক, বাংলা একাডেমি। ১১. সাইমন জাকারিয়া (৪১), পেশা: নাট্যকার ও গবেষক। ১২. মোঃ চান মিয়া (৮৩), পেশা:ভিক্ষাবৃত্তি — ঢাকা মেডিকেল, মাইলদি, নেত্রকোনা।

গবেষণা শিরোনামের প্রেক্ষাপটে তৈরি প্রশ্নপত্রের আলোকে লোকজ শিল্পী ও গবেষক এবং সমাজের নানা শ্রেণী-পেশার মানুষের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। গবেষণাটি সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনার জন্য আমার গবেষণা অঞ্চল ময়মনসিংহ, নেত্রকোনার ও সিলেট জেলার লোকজ শিল্পী, গবেষক ও সমাজের নানা শ্রেণী-পেশার মানুষের সহযোগিতা নিয়েছি। গবেষণা সমীক্ষা এলাকায় বসবাসরত লোকজ সংস্কৃতি নিয়ে যারা দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছেন তাদের পরামর্শে, গবেষণা শিরোনামের সাথে যুক্ত মানুষ ও সংগঠন যে উপজেলাগুলোতে রয়েছে তাদের নিকট থেকে তথ্য আহরণ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি গবেষণা অঞ্চলের যে সব মানুষ জীবিকার তাগিদে ঢাকা শহরে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার সাথে জড়িত রয়েছেন তাদের সহযোগিতাও গ্রহণ করা হয়েছে। যাঁদের মধ্যে রয়েছেন রিক্সা চালক ও ভিক্ষুক থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের সরকারী, বেসরকারি স্বায়ত্বশাশিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। গবেষণা সমীক্ষা অঞ্চলের লোকদের বাইরেও ঢাকা শহরে যে সব গবেষক লোকজ সংস্কৃতি নিয়ে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন তাদের সাক্ষাৎকারও বিশেষ গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করা হয়েছে। গবেষণাকার্য পরিচালনার জন্য যেসব স্থান নির্বাচন করা হয়েছিল তার পরিচয় ও সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী ব্যক্তিদের পেশার আলোকে একটি সারণি তুলে ধরা হল:

➢ সারনি-১

প্রশ্নোত্তর গ্রহণের স্থান	লোকজ শিল্পী	গবেষক	অন্যান্য পেশা	মোট সংখ্যা
ময়মনসিংহ	৭	৩	২০	৩০
নেত্রকোনা	২৫	৪	১১	৪০
বাংলা একাডেমি, ঢাকা।		৭	৩	১০
এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।		২	২	৪
শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা।	১		৩	৪
শাহবাগ, কমলাপুর রেল স্টেশন, ঢাকা।			৪	৪
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য এলাকা	২		৬	৮
সর্বমোট				১০০

ঘাটু গানের সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট অবলম্বনে গবেষণাটি পরিচালনা করার জন্য সমাজের সর্বস্তরের শ্রেণী-পেশার মানুষের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। যাঁদের মধ্যে রয়েছেন তরুণ ছাত্রসমাজ থেকে শুরু করে সমাজের সব থেকে প্রবীণ ব্যক্তিবর্গ।

উক্ত শিরোনামের আলোকে গবেষণার ফলাফল ব্যক্তির বয়স ও অভিজ্ঞতার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাই উত্তর দাতাদের বয়সের আলোকে নিম্নে আরেকটি সারণি তুলে ধরা হল:

➢ সারনি-২

বয়স	লোকজ শিল্পী	গবেষক	অন্যান্য পেশা	মোট সংখ্যা
অনুর্ধ ২০ – ৩০	৪	২	৫	১১
৩১ – ৪০	১৪	৩	৪	২১
৪১ – ৬০	১৩	৯	১৮	৪০
৬১ – ৮০	৩	২	১৯	২৪
৮১ – ১০০	১		৩	৪

গবেষণা শিরোনামের আলোকে তৈরি প্রশ্নপত্র এবং মতামত তুলে ধরা হল:

সুপ্রিয় অংশগ্রহণকারী, *ঘাটু গানের সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট* শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনায় আপনার সহযোগিতা কামনা করছি। আপনার দেয়া তথ্য শুধুমাত্র গবেষণার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হবে এবং প্রয়োজনে তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে।

নাম:

বয়স:

পেশা:

(সঠিক উত্তরটিতে টিক চিহ্ন দিন, প্রয়োজনে একাধিক উত্তর গ্রহণযোগ্য।)

১. আপনি কি কোন দলের সাথে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত ?

(ক) হ্যা (খ) না

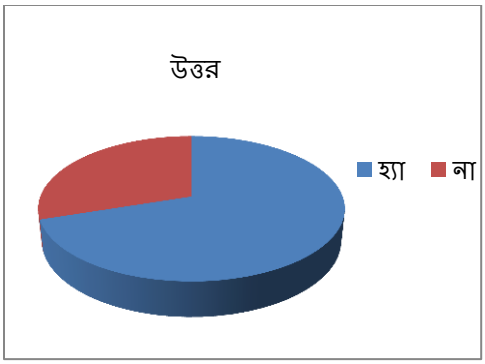

২. উত্তর যদি (ক) হয় তাহলে কোন ধরনের সংগঠনের সাথে আপনি যুক্ত ? আর যদি (খ) হয় তার কারণ কি ?

.....

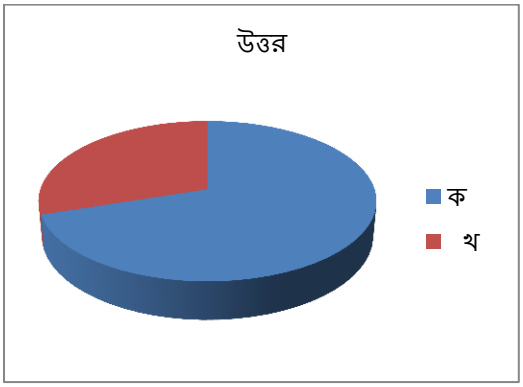

*২ নং প্রশ্নের আলোকে উত্তরদাতাগণ উল্লেখ করেন যে, তারা নৃত্য, সঙ্গীত, জারিগানসহ অন্যান্য সাংস্কৃতিক উপাদান পরিবেশনামূলক সংগঠনের সাথে যুক্ত। এসব সংগঠনের মধ্যে ঝংকার শিল্পগোষ্ঠী, উদয়ন শিল্পগোষ্ঠী অন্যতম। আর যাঁরা এসমস্ত সংগঠনের সাথে যুক্ত নন তার কারণ হিসেবে সময় ও সুযোগের অভাবসহ প্রভৃতি বিষয়াবলীর উল্লেখ করেন।

৩. আমাদের লোকজ সংস্কৃতির উপাদান ঘাটুকে আপনি কি হিসেবে মূল্যায়ন করবেন ?

(ক) গান (খ) নাটক (গ) মিশ্র (ঘ) অন্যান্য

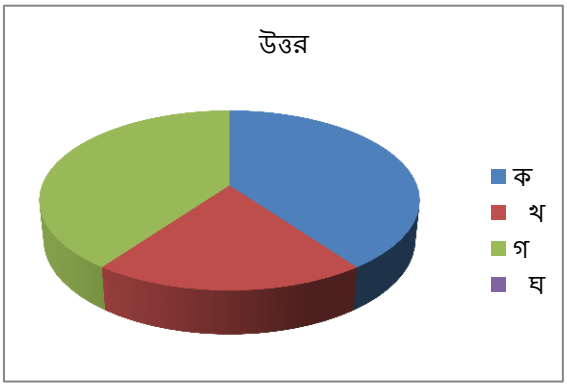

৪. আপনি কি ঘাটু গানের আসরে কখনও উপস্থিত ছিলেন?

(ক) হ্যা (খ) না

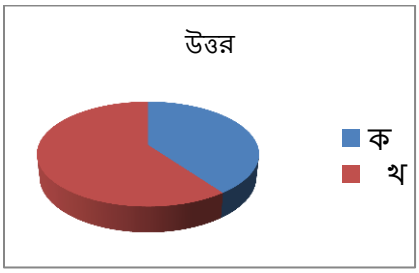

৫. আপনি কি কখনো ঘাটু গানের আসরে অভিনেতৃ (স্ত্রী ও পুরুষ) হিসেবে অংশগ্রহণ করেছেন ?

(ক) হ্যা (খ) না

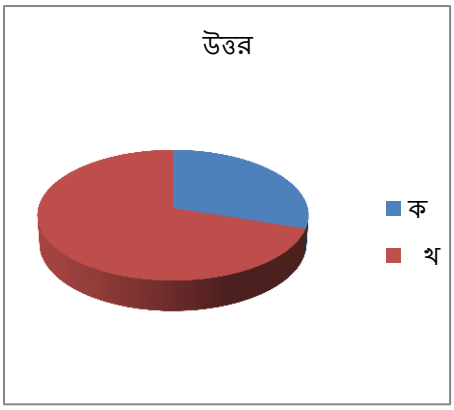

৬. আপনি যে দলের সাথে যুক্ত, ঐ দল আপনাকে ঘাটু গান করতে সাহায্য করে কিনা ?

(ক) হ্যা (খ) না (গ) প্রযোজ্য নয়

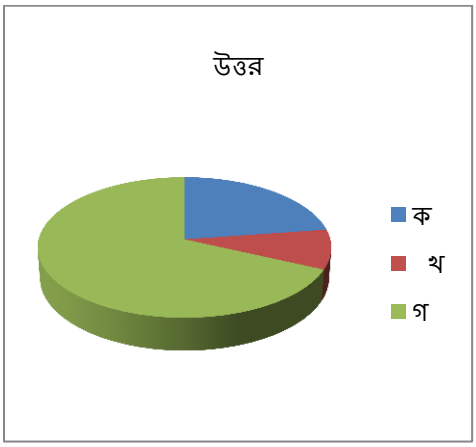

৭. আপনার পরিবার আপনাকে এ গানের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে সাহায্য করে / করতো কিনা ?

(ক) হ্যা (খ) না (গ) প্রযোজ্য নয়

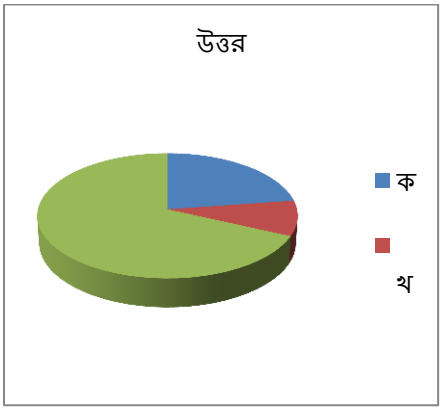

৮. বর্তমান সমাজব্যবস্থায় ঘাটু গান করে জীবিকা নির্বাহ করা সম্ভব কিনা ?

(ক) হ্যা (খ) না

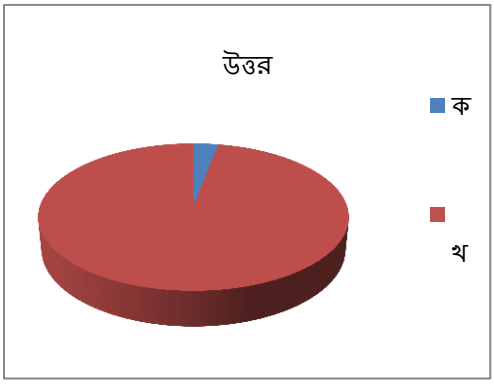

৯. ঘাটু গানের সাথে যুক্ত থাকাতে আপনি সমাজে সমাদর পাচ্ছেন কিনা ?

(ক) হ্যা (খ) না

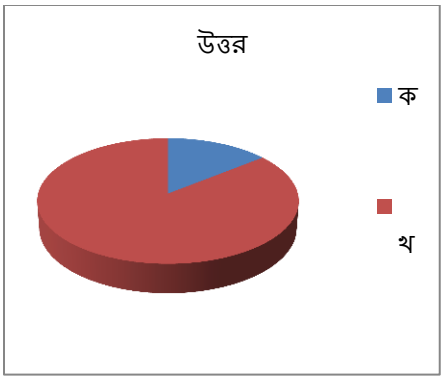

উপরের প্রশ্নের আলোকে লোকজ শিল্পীদের বাইরে অনেক গবেষক বলেছেন যে, এ বিষয় নিয়ে গবেষণা করার ক্ষেত্রে তারা সমাজের অনেক শ্রেণী-পেশার মানুষের সমাদর পেয়েছেন। আবার কেউ কেউ এর ভিন্ন মতও পোষণ করেছেন।

১০. ঘাটু গানে যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতার অভাব রয়েছে কিনা ?

(ক) হ্যা (খ) না

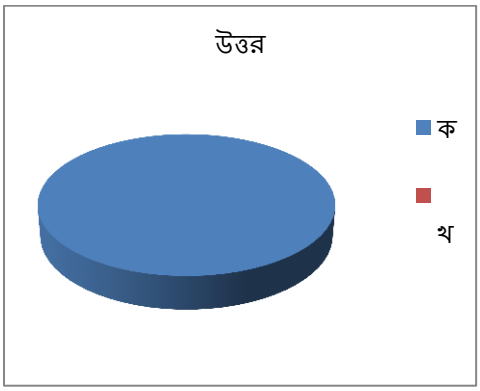

১১. পৃষ্ঠপোষকতার অভাব যদি থেকে থাকে, তবে তার পেছনে কারণ কি ?

.....

*১১ নং প্রশ্নের আলোকে ঘাটু গানের পৃষ্ঠপোষকতার অভাবের পেছনে বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটের জন্য এ গানের সাংস্কৃতিক অচলাবস্থা, সমাজের বিত্তশালী ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষিত জনগণের অসচেতনতা, অর্থনৈতিক অবকাঠামো, আকাশ সংস্কৃতির প্রভাব, প্রচারের অভাব ও বিলুপ্তিকে অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন।

১২.যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতা পেলে আপনি এ গানের সাথে যুক্ত থাকবেন কিনা ?

(ক) হ্যা (খ) না (গ) প্রযোজ্য নয়

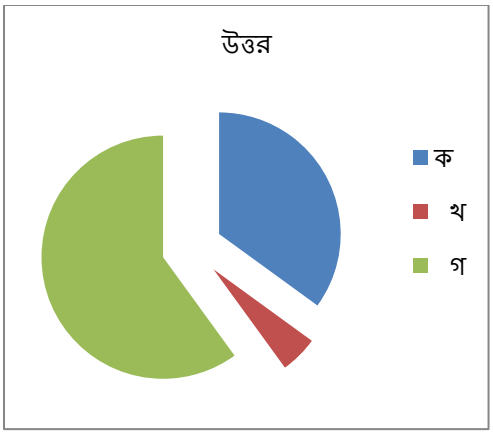

১৩. আপনার মাসিক আয় কত ? (ঘাটু গানসহ অন্যান্য সাংস্কৃতিক উপাদানের সাথে যারা যুক্ত)

.....

যারা ঘাটু গানসহ অন্যান্য লোকজ সাংস্কৃতিক উপাদানের সাথে সরাসরি যুক্ত রয়েছেন, তাদের জন্য *১৩ নং প্রশ্নটি উত্থাপন করা হয়। তবে তাঁদের এ পেশার মধ্যে দিয়ে অর্জিত অর্থের পরিমাণ এতই কম যে তাঁরা আর সেটি উল্লেখ করতে চাননি। আবার অনেকেই নির্দ্বিধায় উল্লেখও করেছেন।

১৪.ঘাটু গানে আপনি কি হিসেবে অংশগ্রহণ করেছিলেন ?

(ক) শ্যাম (খ) রাই (গ) দোহার (ঘ) বাদক ও অন্যান্য

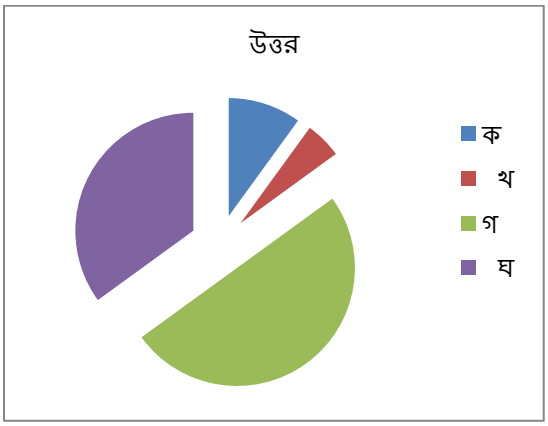

১৫. ঘাটু গানে যে নারী-পুরুষের প্রসঙ্গ আসে সেখানে নারীচরিত্রে কারা অভিনয় করেন ?

(ক) নারী (খ) পুরুষ

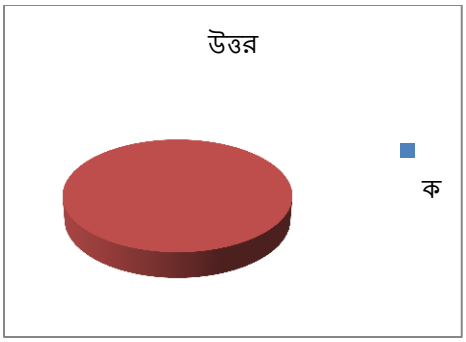

১৬. উত্তর যদি (খ) হয় তবে নারী চরিত্র উপস্থাপনে পুরুষ কুশীলবেরা কি কি পরিধান করেন ?

.....

*১৬ নং প্রশ্নের আলোকে আমরা দেখতে পাই যে নারী চরিত্র উপস্থাপনে পুরুষ কুশীলবগণ ঘাগরি, ব্লাউজ, পেটিকোট, ওড়না, জারজি জাতীয় নানা রং-বেরঙের কাপড়, মালা, দুপাট্টা, পরচুলসহ ইত্যাদি ব্যবহার করে। এর পাশাপাশি মেয়েরা যে সব পোশাক পরিধান করতো ঘাটু ছোকরাও তাই পরিধান করতো বা করে বলে তারা উল্লেখ করেন।

১৭. আপনি কি মনে করেন যে ঘাটু গানে যিনি নারী চরিত্রে অভিনয় করেন তার লম্বা চুল রাখা প্রয়োজন ?

(ক) হ্যা (খ) না

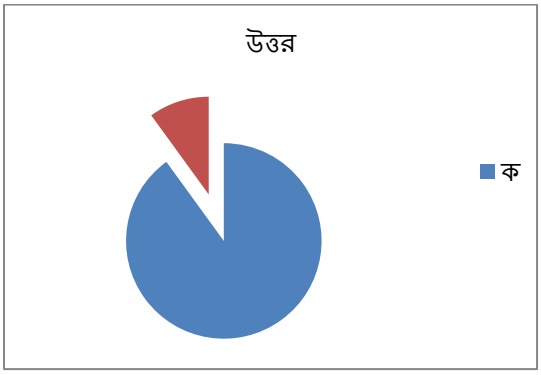

অনেকে এ প্রশ্নের আলোকে মন্তব্য করেছেন যে, চুল রাখলে ভাল হতো। যদি না থাকতো তখন কৃত্রিম চুল ব্যবহার করা হতো।

১৮. আপনি যদি কখনও নারী চরিত্রে অভিনয় করে থাকেন, তখন কি কি পরিধান করেছিলেন ?

.....

*১৮ নং প্রশ্নের আলোকে যারা নারী চরিত্রে অংশগ্রহণ করেছিলেন তারা ১৬ নং প্রশ্নের অনুরূপ উত্তর উপস্থাপন করেন।

১৯. আপনি কি মনে করেন সেখানে নারীকে উপস্থাপনে আপনি লিঙ্গভিত্তিক আচরণে অতিমাত্রা যুক্ত করেছিলেন ?

(ক) হ্যা (খ) না (গ) প্রযোজ্য নয়

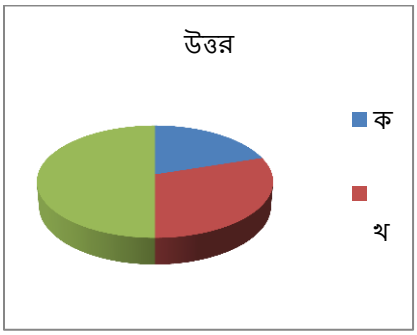

২০. ঘাটু গানে যে নারীকে উপস্থাপন করা হয়, সেখানে কি লিঙ্গভিত্তিক আচরণে অতিমাত্রা যুক্ত করা হয় ?

(ক) হ্যা (খ) না

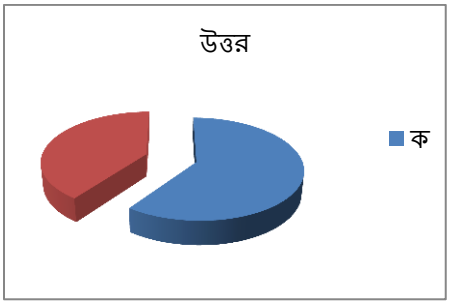

২১. আপনি কি মনে করেন যে ঘাটু গানের নারী চরিত্র উপস্থাপনে পুরুষ কুশীলববৃন্দ তার কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন করেন ?

(ক) হ্যা (খ) না

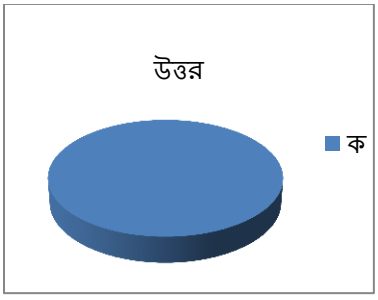

২২. ঘাটু গানে নারীকে উপস্থাপনের জন্য যে বস্ত্রাদি পরিধান করেন তা কি বাস্তবের অনুরূপ ?

(ক) হ্যা (খ) না

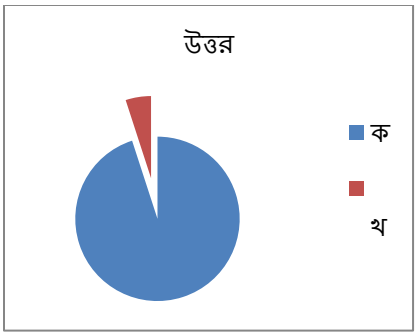

২৩. ঘাটু গানের অভিনেতৃর (স্ত্রী ও পুরুষ) জন্য মেক-আপ নেয়া কি বাধ্যতামূলক ?

(ক) হ্যা (খ) না

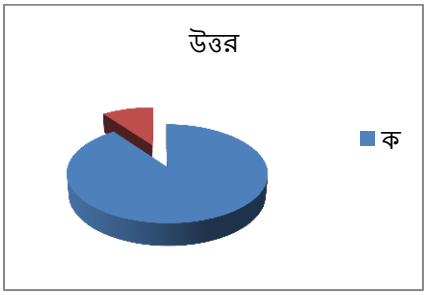

২৪. রাই চরিত্রে রূপদানকারী ছোকড়ার ক্ষেত্রে মেক-আপ কি অতি গুরুত্বপূর্ণ ?

(ক) হ্যা (খ) না

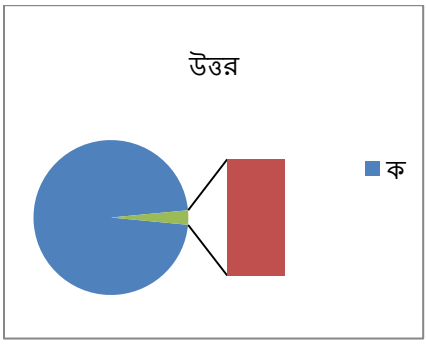

২৫. আপনি কি মনে করেন নারী চরিত্র রূপদানে মেক- আপ (অঙ্গ সজ্জা) সহায়ক ভূমিকা পালন করে ?

(ক) হ্যা (খ) না

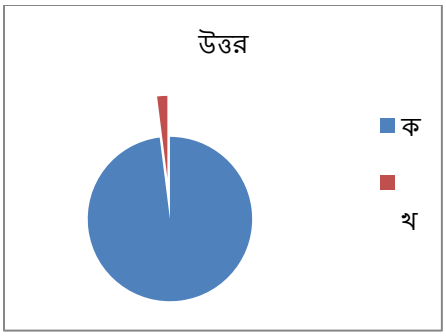

২৬. ঘাটু গানে নারীবেশী সুন্দর কিশোরের মাঝে কি নারীর সৌন্দর্যের সন্ধান করা হয় ?

(ক) হ্যা (খ) না

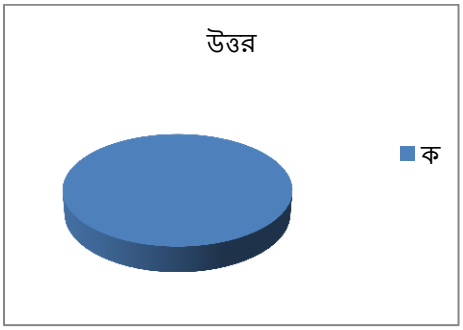

২৭. ঘাটু গান কি অন্য কোন নামে পরিচিত ?

(ক) হ্যা (খ) না

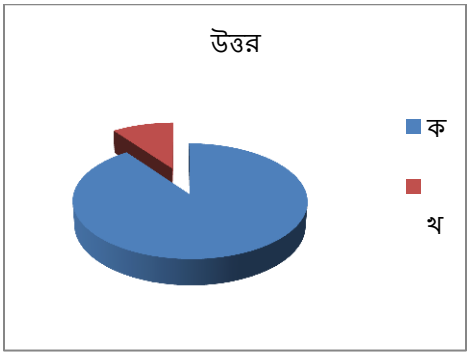

২৮. উত্তর যদি (ক) হয় তাহলে তার নাম কি ?

.....

ঘাটু গানের ভিন্ন নামের প্রসঙ্গে *২৭ নং প্রশ্নের আলোকে গাড়ু, ঘেটু, ঘাঢু এর উল্লেখ পাওয়া যায়।

২৯. আপনি কি মনে করেন ঘাটু গান বংশ পরম্পরার গান ?

(ক) হ্যা (খ) না

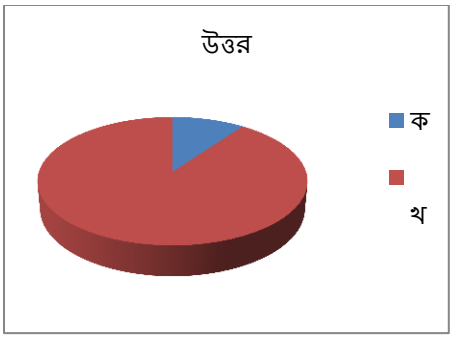

৩০. ঘাটু গানের আসর সাধারণত বৎসরের কোন সময়ে বসতো ?

(ক) বর্ষা কাল (খ) শরৎ কাল (গ) সারা বছর (ঘ) অন্যান্য

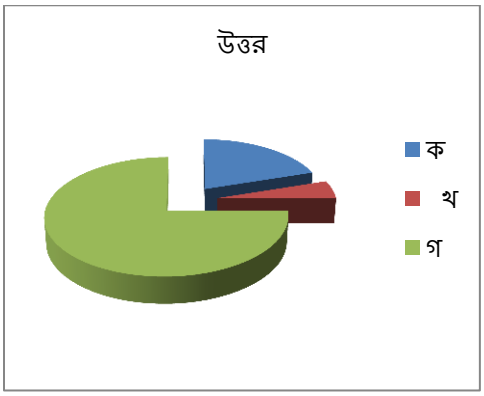

৩১. ঘাটু গানের অভিনেতারা সাধারণত কোন ধর্মের অনুসারী ?

(ক) হিন্দু (খ) মুসলমান (গ) অন্যান্য (ঘ) হিন্দু-মুসলমান উভয়ই

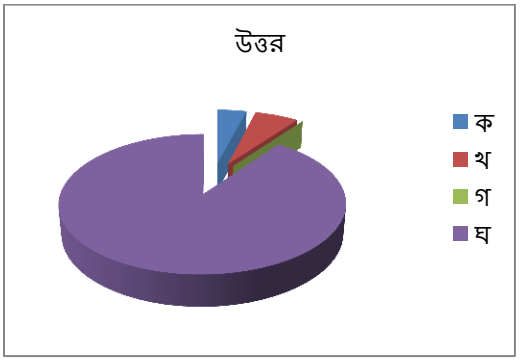

৩২. ঘাটু গানের দর্শক স্রোতারা কোন ধর্মাবলম্বী ?

(ক) হিন্দু (খ) মুসলমান (গ) অন্যান্য (ঘ) সকল ধর্ম

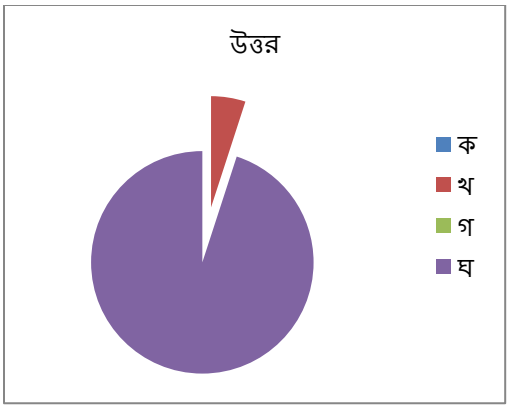

৩৩. ঘাটু গানে কোন কোন বিষয়াবলী উঠে আসে ?

(ক) রাধা কৃষ্ণের কাহিনী (খ) নর নারীর সাধারণ প্রেম বিরহ (গ) সমসাময়িক বিষয়বস্তুসহ ইসলাম ধর্মের নানা বিষয় ও অন্যান্য (ঘ) উপরোক্ত সবগুলো

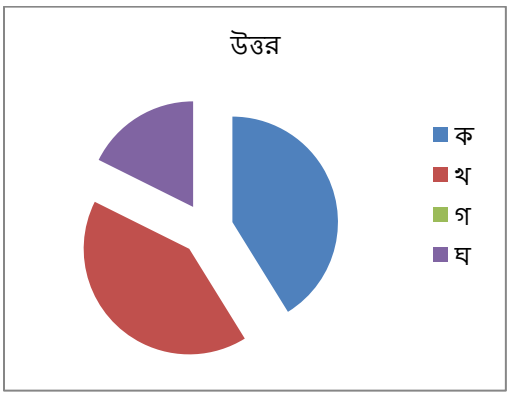

৩৪. আপনি কি ঘাটু গানকে ধর্মীয় প্রার্থনার অংশ হিসেবে উপস্থাপন করেন ?

(ক) হ্যা (খ) না

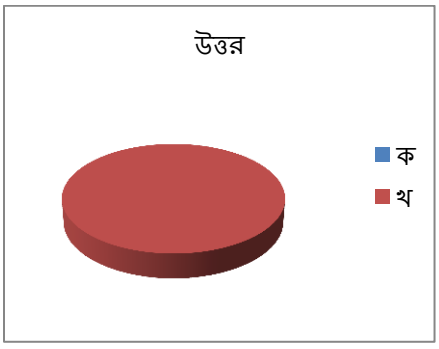

৩৫. আপনি কি ঘাটু গানের সাথে শুধুই নিছক বিনোদনের জন্য যুক্ত ছিলেন বা থাকেন ?

(ক) হ্যা (খ) না

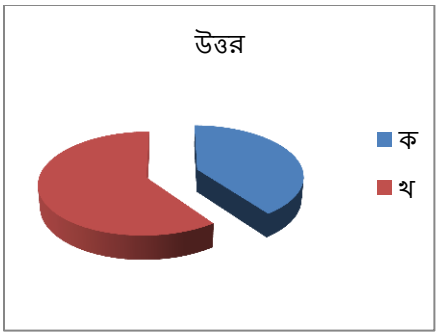

৩৬. আপনি কি কখনও ঘাটু গানে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন ?

(ক) হ্যা (খ) না

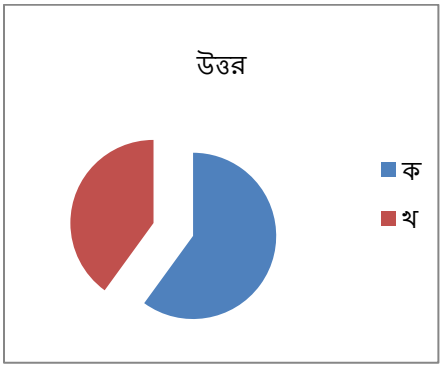

৩৭.সমাজের কোন শ্রেণী পেশার মানুষ ঘাটু গানের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন বলে আপনি মনে করেন ?

.....

*৩৭ নং প্রশ্নের আলোকে আমরা জানতে পারি যে ধনাঢ্য, বিনোদন প্রিয়, তালুকদার শ্রেণী-পেশার মানুষ, সামাজিক নেতৃস্থানীয় ও যুবক শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গসহ কিছু লোকায়িত ধর্মীয় সাধকেরা এ গানের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।

৩৮. যিনি ঘাটু পালতেন তাকে কি নামে ডাকা হতো ?

(ক) সখীনদার (খ) সরকার বা মরাদার (গ) অন্যান্য

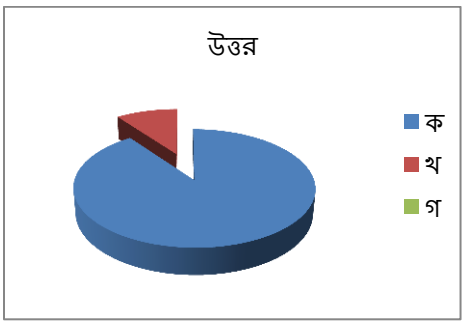

৩৯ .ঘাটু নাচ- গান যিনি পরিচালনা করতেন তাকে কি বলা হতো ?

(ক) সরকার বা মরাদার (খ) সখীনদার (গ) অন্যান্য

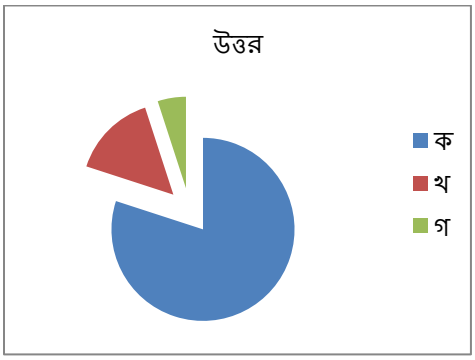

৪০. আপনি কি কখনও ঘাটু পালতেন ?

(ক) হ্যা (খ) না

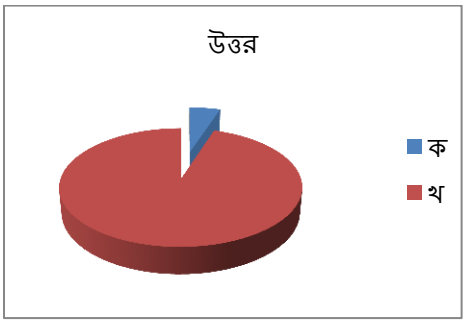

৪১. আপনি কি মনে করেন যে, ঘাটুর সাথে দলের অন্যকোন সদস্য, সখীনদার বা সরকারের সাথে অভিনয় বহির্ভূত সম্পর্ক থাকতো ?

(ক) হ্যা (খ) না (গ) কখনো কখনো (ঘ) মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন

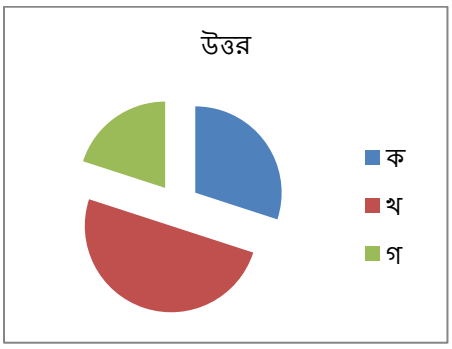

এ প্রশ্নের আলোকে অনেকেই বলেছেন যে, অভিনয়ের বাইরে ঘাটুর সাথে দলের অন্য সদস্যদের গুরু শিশ্যের মত সম্পর্ক বিরাজমান থাকতো।

৪২. ঘাটু গান কেন বাংলাদেশের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে হতো বলে আপনি মনে করেন ?

.....

*৪২ নং প্রশ্নের আলোকে ঘাটু গানের প্রচলন বাংলাদেশের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে হওয়ার পেছনে- ঐ সমস্ত অঞ্চলে বিনোদনের অন্য কোন মাধ্যেমের প্রচলন না থাকাসহ ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় সামাজিক কারণগুলোকে উল্লেখ করেন।

৪৩. ঘাটু গানের অভিনেতারা কি চরিত্র উপস্থাপনে অতিমাত্রা যুক্ত করেন ?

(ক) হ্যা (খ) না

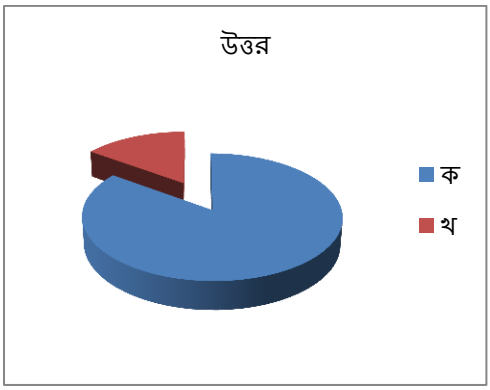

৪৪. তারা কি আঙ্গিক, বাচিক ও বাহ্যিক সর্ববিষয়েই অতিমাত্রা যুক্ত করেন ?

(ক) হ্যা (খ) না (গ) শুধু বাহ্যিক পোশাক ও মেক- আপ (ঘ) শুধু আঙ্গিক ও বাচিক

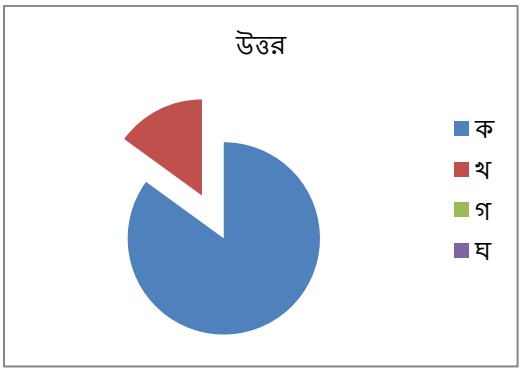

প্রশ্নপত্রের আলোকে উত্তরদাতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের শতকরা প্রকাশ নিম্নরূপ:

- সারণি-৩

ক্রমিক নং	উত্তরের শতকরা হার			
	ক	খ	গ	ঘ
১	৭০%	৩০%		
*২				
৩	৪০%	২০%	৪০%	
৪	৪০%	৬০%		
৫	৩০%	৭০%		
৬	২৫%	১০%	৭৫%	
৭	২৫%	১০%	৭৫%	
৮		১০০%		
৯	৫%	৩০%		
১০	১০০%			
*১১				
১২	৩৫%	৫%	৬০%	
*১৩				
১৪	১০%	৫%	৫০%	৩৫%
১৫		১০০%		
*১৬				
১৭	৯০%	১০%		
*১৮				

১৯	২০%	৩০%	৫০%	
২০	৬০%	৪০%		
২১	১০০%			
২২	৯৫%	৫%		
২৩	৯০%	১০%		
২৪	৯৭%	৩%		
২৫	৯৮%	২%		
২৬	১০০%			
২৭	৯০%	১০%		
*২৮				
২৯	১০%	৯০%		
৩০	২০%	৫%	৭৫%	
৩১	৪%	৬%		৯০%
৩২		৫%		৯৫%
৩৩	৭০%	৭০%		৩০%
৩৪		১০০%		
৩৫	৪০%	৬০%		
৩৬	৬০%	৪০%		
*৩৭				
৩৮	৯০%	১০%		
৩৯	৮০%	১৫%	৫%	
৪০	৫%	৯৫%		
৪১	৩০%	৫০%	২০%	

*৪২				
৪৩	৮৫%	১৫%		
৪৪	৮৫%	১৫%		

উল্লিখিত প্রশ্নপত্রটি একই সাথে ঘাটু শিল্পী, লোকজ গবেষক, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষসহ সবার জন্য উপস্থাপন করা হয়। তাই প্রশ্নের উত্তরদাতাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য প্রশ্নের উত্তর প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়।

প্রশ্নপত্রের আলোকে আমরা দেখতে পাই আমাদের বর্তমান সমাজের সাংস্কৃতিক ও আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট, শিক্ষার প্রসার ও ভৌগোলিক পরিবর্তনের ফলে মানুষের জীবন ও জীবিকার পরিবর্তন এবং আকাশ সংস্কৃতির প্রসারসহ বিভিন্ন কারণে এ গানের গ্রহণযোগ্যতা সমাজ থেকে হ্রাস পেয়েছে।

৬.৩ চরিত্র উপস্থাপনে সাংস্কৃতিক কৌশল:

নারীকে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে যে সাংস্কৃতিক কৌশল অবলম্বন করা হয় তা আমাদের দেশে বৈচিত্র্যময়। আমাদের লোকজ সংস্কৃতিতে যে নারীকে তুলে ধরা হয় তা বাস্তবিক অর্থেই হয়ে ওঠে লোক কবির আবেগমিশ্রিত অন্তরের ভালবাসা ও প্রতিহিংসার পরশে তৈরি সুনিপুণ প্রতিমা। ছেলেদের মেয়ে সেজে অভিনয়ের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য তুলে ধরে Raleigh (as cited in Tian, 2000) বলেন,

> …aesthetic rationale is the assumption that male artists are superior in understanding the true essence of women and that female impersonation is a genuine art because male artists are considered capable of presenting women in a more idealized and artistic manner while actresses tend to exploit their natural properties and appear to be too realistic and without aesthetic value. (p: 86)

এর পাশাপাশি নারী চরিত্র পুরুষের দ্বারা উপস্থাপনের ক্ষেত্রে 1787 সালে দেখা এক পরিবেশনার আলোকে Goethe (as cited in Tian, 2000) বলেন,

> We see a youth who has studied the idiosyncrasies of the female sex in their character abd behavior; he has learnt to know them, and reproduces them as artist; he plays not himself, but a third, and, in truth, a foreign nature. We come to understand the female sex so much the better because someone has ovserved and meditated on their ways, and not the process itself, but the result of the process, is presented to us. (p: 86)

বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উপাদানে নারীকে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা হয়। *চাইনিজ মেল ডান* এ নারীকে উপস্থাপনের কৌশল প্রসঙ্গে একজন বিখ্যাত *মেল ডান* অভিনেতার সাক্ষাৎকারের আলোকে Kui (as cited in Tian, 2000) বলেন,

> Taking my body as a female, I have to transform my heart into that of a female, and then my tender feelings and charming postures can become truthful and lifelike. If a trace of male heart remains, there must be a bit that does not resemble

> a female. ⋯If a male impersonates a female on the stage, When he plays a chaste woman, he must make his own heart chaste, and does not lose her chastity even if she is laughing and making jokes; when he plays a wanton woman, he must make his own heart loose, and does not hide her wantonness even if she is sitting sedately;⋯When he plays a shrew, he must make his own heart stubborn and perverse, and does not fall silent even if she is in the wrong. (p: 84)

জাপানি *অ্যান্নাগাটার* অভিনয় কৌশল সম্পর্কে আন্নাগাটার একজন বিখ্যাত শিল্পী তাঁর অভিনয় জীবনের বাইরে প্রাত্যহিক জীবনের আচার- আচরণের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এ প্রসঙ্গে Ayame (as cited in Tian, 2000) বলেন,

> ⋯if he does not live his normal life as if he was a woman, it will not be possible for him to be called a skillful *onnagata.* The more an actor is persuaded that it is the time when he appears on the stage that is the most important in his career as an *onnagata,* the more masculine he wiil be. It is better for him to consider his everyday life as the most important. (p: 85)

অপরদিকে আলোচিত কৌশলের বিপরীতে একজন *কাবুকির* বিখ্যাত অভিনেতা তাঁর অভিনয় কৌশলের কথা তুলে ধরেন। তিনি প্রাত্যহিক জীবনের বাইরে মহড়াকালীন সময়ের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন। এ প্রসঙ্গে Jurobe (as cited in Tian, 2000) বলেন,

> One of the greatest *kabuki* actors, sakata Tojuro (1647-1709), used to take care of the *onnagata* opposite him like a real woman. During rehearsals he had dishes served according to the taste of each *onnagata* "in a way which would have made them easily eaten by a real woman," and he treated them " as if they were woman". (p: 85-86)

ইন্দোনেশিয়ার বালিতে আমরা কিছু পরিবেশনার উল্লেখ পাই যেখানে নারী অভিনেত্রীরা একইসাথে স্ত্রী ও পুরুষের চরিত্রে অভিনয় করে থাকেন। Ni Made Pujawati এরকম একজন নৃত্য শিল্পী যিনি একই সাথে স্ত্রী ও পুরুষের ভূমিকায় অভিনয় করে থাকেন৷ তাঁর প্রসঙ্গে Diamond (2008) বলেন,

> …her latest work, " Candra Kirana," which she developed after researching various manuscripts of the *Malat story*. Resembbling a variation of "Panji Semirang," a *bebanchian* dance that features cross-dressing, the solo work required severel shifts in gender and personae, beginning with the princess Candra Kirana combinh her hair and applying makeup in advance of her wedding to Prince Panji. (p: 254)

জাপানি *নো*তে নারী চরিত্রের অভিনয় কৌশল প্রসঙ্গে Zeami (as cited in Tian, 2000) বলেন,

> … "first truly become the thing you are performing; then find the skill to imitate its action as well"-applies to the playing of each role in *no*, including the performance of a woman's role by a man. " When performing a woman's role," Zeami continues, the actor should slitly bend the hips, hold his hands high, sustain the whole body in agraceful manner, feel a softness in his whole manner of being, and use his physique in a pliant manner." …the actor should not just imitate the external appearance of a woman; he should identify the sprit of a woman. (p: 85)

আমাদের দেশের কিছুসংখ্যক সাংস্কৃতিক উপাদানে নারীকে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে উপরে আলোচিত কৌশলগুলোর প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। তবে অনেক লোকজ উপস্থাপনায় কখনো কখনো উপরের বিষয়াবলী অভিনেতার মনে স্থান পায় না এ কথা সত্য। তবে যাঁরা নারী চরিত্র উপস্থানে অংশগ্রহণ করে থাকেন তাদের মধ্যে চেতন ও অবচেতন স্তর থেকে কোন না কোন ভাবে উক্ত কৌশলগুলো প্রভাব ফেলে বলে আমার বিশ্বাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগের প্রযোজনা সীতার বনবাস ও কমলা রানীর সাগর দিঘীতে আমরা নারী চরিত্র উপস্থাপনে পুরুষের অংশগ্রহণ দেখতে পাই। উক্ত প্রযোজনা গুলোতে আলোচিত কৌশল গুলোর সুস্পষ্ট প্রতিফলন দেখা যায়।

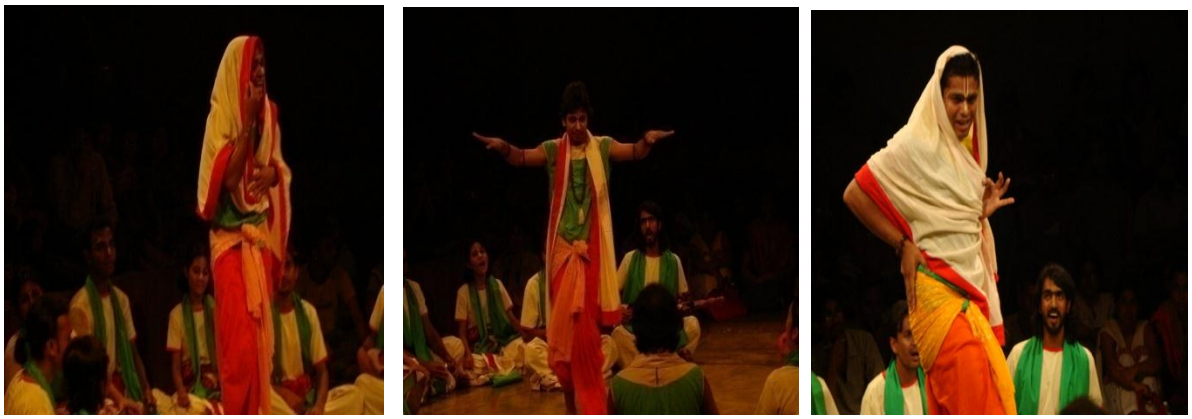

চিত্র-১৪ : নাটক সীতার বনবাস, প্রযোজনা- নাট্যকলা বিভাগ, ঢা.বি। ছবি: সংগৃহীত

সীতার বনবাস নাটকটিতে আমরা দেখতে পাই নারী চরিত্র উপস্থানে পুরুষ কুশীলববৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। অপর দিকে কমলা রানীর সাগরদিঘী নাটকটিতে নারী চরিত্র উপস্থাপনে পুরুষ কুশীলববৃন্দের পাশাপাশি নারী কুশীলববৃন্দও একই সাথে নারী ও পুরুষের চরিত্র উপস্থাপন করে।

চিত্র: নাটক- কমলা রানীর সাগর দিঘী, প্রযোজনা- নাট্যকলা বিভাগ, ঢা.বি। ছবি: সংগৃহীত

উভয় ক্ষেত্রেই এবং সীতার বনবাস নাটকটিতে নারীকে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে উপরের পদ্ধতির আলোকে গৃহীত কৌশলের চমৎকার পারদর্শিতা পরিলক্ষিত হয়।

৬.৪ উপস্থাপনা কৌশল ও সামাজিক মূল্যায়ন:

ঘাটু গানের মত চাইনিজ মেল ডান, জাপানি আন্নাগাটাসহ অন্যান্য যে সব সাংস্কৃতিক উপাদানে নারী চরিত্র পুরুষ কুশীলববৃন্দের দ্বারা উপস্থাপন করা হয় সেখানে অভিনেতারা প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে শিক্ষা গ্রহণের মধ্যে দিয়ে তাঁদের চরিত্র উপস্থাপন করে থাকেন। আমাদের ঘাটু গানেও দেখা যায় যে ঘাটু ছোকরাকে ঘাটু দলের অধিকর্তা, যিনি সরকার বা ক্ষেত্র বিশেষে মরাদার নামে পরিচিত তিনি দীর্ঘ দিন গান ও নৃত্যের সাথে তালিম দিয়ে তাকে ঘাটু গানের জন্য উপযোগী করে তোলেন। আমার গবেষণা কাজের জন্য মাঠ পর্যায়ে মহড়া ও অন্যান্য কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ, তথ্যচিত্র গবেষণা এবং একান্তে গভীর সাক্ষাৎকারের মধ্যে দিয়ে যাদের নিকট থেকে সহযোগিতা নিয়েছি তার আলোকে কয়েকজন ঘাটু শিল্পী ও সখীনদারদের সাথে কথা বলে অর্জিত অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ কিছু তথ্য তুলে ধরছি।

মি. ক একজন সৌখিনদার। তিনি যৌবনে একজন দুর্ধর্ষ ডাকাত ছিলেন এবং ঘাটু পালতেন। তার সাথে কথা বলে আলাপ-চারিতার মধ্যে দিয়ে পর্যায়ক্রমে তাঁর জীবনের বিভিন্ন ধরনের কাহিনী ও আজ থেকে ৩৫-৪০ বছর পূর্বের সময়ে বাংলার তৎকালীন সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট এবং সাধারণ মানুষের অন্যতম বিনোদনের মাধ্যমসহ জীবিকা নির্বাহের তথ্যাবলি সম্পর্কে অবগত হই। এসময় তিনি আলাপচারিতার মধ্যে দিয়ে তার জীবনের সমস্ত ঘটনা অকপটে বলে যান। আর এর মধ্যে দিয়ে ঘাটু গানের অনেক রহস্যময় তথ্যাবলি আবিষ্কার করতে সক্ষম হই। তিনি অনেক সুন্দর গান করেন এবং অনেকগুলো বাদ্যযন্ত্রে পারদর্শী। প্রথম দিনের সাক্ষাৎ শেষে আমি তার আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হই এবং আমার অনুরোধে রাতে গানের আসর বসানো হয়। যেখানে তিনি বিভিন্ন ধরনের বৈঠকি গান পরিবেশন করেন। এর পর আমার অনুরোধে কয়েকটা ঘাটু গান শোনান। এর পরের সময় গুলোতে তিনি আমাকে ঘাটু গান সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের আলোকে এই গানের সাথে তার সম্পৃক্ততা, ঘাটু ছোকরাকে সংগ্রহ করার কাহিনী, ঘাটু ছোকরাকে নিয়ে অন্য গ্রামের মানুষের সাথে দ্বন্দ্ব এবং শেষ পর্যন্ত খুন করার কাহিনীও অকপটে স্বীকার করেন। তারপর তাঁর জেল জীবনের কাহিনী ও সেখান থেকে সাজা কমিয়ে বের হয়ে আসার পর জনগণের ভোটে স্থানীয় প্রতিনিধি হওয়ার কথা ব্যক্ত করেন। এর পর আমি তাঁর নিকট বিভিন্ন ভাবে কথা প্রসঙ্গে ঘাটু গানে যে ছোকারারা নারী চরিত্র উপস্থাপন করতো সে সম্পর্কে জানতে চাই। তিনি বলেন তার জীবনে তিনি ৮-১০ জন ছোকরাকে ঘাটু গান এ এনে তালিম দিয়ে তৈরী করেছেন। অনেক সময় দেখা গেছে যে এমনও হয়েছে ভাল ছোকরাকে টাকার বিনিময়ে অন্য দলের কাছে চুক্তি বদ্ধ ভাবে দিয়ে দিয়েছেন। নারী চরিত্র উপস্থাপনের কৌশল প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, আমি সাধারণত তাদেরকে মাইগ্যা (মেয়ে) মানুষের মত আচরণ করতে বলতাম। তারা কীভাবে হাটে, তাকায়, কথা বলে, বসে এবং বিশেষ মুহূর্তে মেয়েলী স্বভাবের দ্বারা কিভাবে পুরুষ মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করে সেটা

দেখতে বলতাম। তিনি উল্লেখ করেন যে, মোট কথা একজন মেয়ে মানুষ যা যা করে আমি ঠিক সেগুলোই তাদেরকে অনেকাংশে অনুসরণ করতে বলতাম। আর যে সমস্ত ছেলেদেরকে এই গানের জন্য নির্বাচন করা হত তাদের অনেকের মধ্যে প্রথম থেকেও মেয়েলিপনা যুক্ত থাকতো। এরপর সাজ-পোশাক নেওয়ার পর কেউ আর তাদেরকে মেয়ে ভিন্ন অন্য কিছু মনে করতো না। নারী চরিত্র উপস্থাপনের জন্য একজন নারী যেমন পোশাক-আশাক ব্যবহার করেন ঠিক ঘাটু ছোকরাও তেমনটা ব্যবহার করতো। আমার প্রশ্নের আলোকে তিনি বলেন যে, ঘাটু ছোকরা যে মেয়ে চরিত্র আসরে উপস্থাপন করতো তার জায়গায় যদি কোন মেয়েকে দেয়া হত, তাহলে সেও তার মত করে এত সুন্দর করে উপস্থাপন করতে পারতো না। কথা প্রসঙ্গে আরও জানা যায় যে ঘাটু ছোকরা তার চরিত্র উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শারীরিক ও আচরণগত জায়গা থেকে অতিমাত্রা যুক্ত করে থাকে।

মি. খ তিনিও একজন ঘাটু দলের ম্যানেজার ছিলেন। তাঁর সাথে কথা বলেও ঘাটু গান সম্পর্কে উপরে উপস্থাপিত তথ্যাবলির অনুরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি নারী চরিত্র উপস্থাপনকারী ছোকরার মেক-আপও করাতেন। এ সময় তিনি উল্লেখ করেন যে মায়া মানুষেরা যে সব জিনিস পরিধান করে ঘাটু ছ্যরাও ওইগুলা পরিধান করতো। আর চরিত্র উপস্থাপন করার জন্য বিশেষ কোন পদ্ধতি ব্যবহার করা হত না। ওরা এমনিতেই আসরে আসলে মানুষের কাম সারা হইয়া যাইত। এবার এ প্রসঙ্গে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি যে ঐ ঘাটু ছেলের জায়গায় যদি কোন মেয়েকে আনা হত তাহলে কি মানুষের কাম সারা হইতো। এর উত্তরে তিনি বলেন, মাথা খারাপ ! একজন মেয়ে কি আর ঐ সব করতে পারে নাকি৷ সার্বিক দিক থেকে তার সাথে কথা প্রসঙ্গে আমি জানতে পারি যে, নারী চরিত্র উপস্থাপনের ক্ষেত্রে অভিনেতা তার লিঙ্গভিত্তিক আচরণে অতিমাত্রা যুক্ত করতেন।

মি. গ একজন ঘাটু শিল্পী এবং রাই চরিত্রে অভিনয় করেন। তিনি এখনও তার প্রাণের টানে এ গানের সাথে যুক্ত রয়েছেন। কিন্তু বর্তমান সমাজ বাস্তবতার আলোকে তিনি আর এখন এই গান করতে চান না। তিনি আগে লোকজ বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়েই তার জীবিকা নির্বাহ করতেন। কিন্তু বর্তমান সমাজের কঠোর বাস্তবতার আলোকে ঐ পেশা ত্যাগ করে নিজের এলাকা ছেড়ে ঢাকায় চলে এসেছেন এবং রাজ মিস্তরির যোগালি হিসেবে কাজ করেন। আর মাঝে মাঝে গানের বায়না পেলে গান করেন। তিনি তাঁর নিজ এলাকায় ঘাটু গান করতে চান না। তাঁর কানের ছিদ্র করা প্রসঙ্গে জানতে চাইলে প্রথমে এড়িয়ে গেলেও পরে বলেন যে নাচ গান করতে গিয়ে সুবিধার জন্য এ কাজ করা হয়েছে। তিনি নারী চরিত্র উপস্থাপনের প্রসঙ্গে বলেন যে, একজন মেয়ে যেমন করে আমিও তেমনটাই করার চেষ্টা করি। এক্ষেত্রে তিনি হাঁটা-চলা, কথা বলা ও আচার- আচরণের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন।

মি. ঘ একজন ঘাটু শিল্পী এবং বর্তমানে চাকুরীজীবী। তিনি ঘাটু গানে কৃষ্ণ চরিত্র উপস্থাপন করে থাকেন। তাঁর সাথে কথা বলার মধ্যে দিয়েও দেখা যায় যে নারী চরিত্র উপস্থানের ক্ষেত্রে অতিমাত্রা যুক্ত করা হয় না। তবে নারীবেশী বালকের মধ্যে মানুষেরা নারীদেহের সৌন্দর্যকে খুঁজতে থাকেন।

মি. ঙ একজন ঘাটু শিল্পী এবং নারী চরিত্র করে থাকেন। তিনিও এ গান করার জন্য সমাজে অনেক সময় নিগ্রহের স্বীকার হয়ে থাকেন। তিনিও সমাজের মানুষের এ গান সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা ও মানসিকতার কারণে আর যুক্ত থাকতে চান না। তবে ভাল সময় যদি ফিরে আসে তবে তিনি যুক্ত থাকবেন। তাঁর সাথে কথা প্রসঙ্গে জানা যায় যে নারী চরিত্র উপস্থাপনে তিনি বিশেষ কোন কৌশল অবলম্বন করেন না। বাস্তবে নারীরা যেরকম আচার আচরণ করেন তিনিও কেবল সেরকমটা করার চেষ্টা করেন।

এর পাশাপাশি আরও কয়েকজন ঘাটু শিল্পীর সাথে কথা বলে জানতে পারি যে, তাঁরা জীবনের প্রথম পর্যায়ে ঘাটু গানের সাথে যুক্ত ছিলেন। বর্তমান সমাজব্যবস্থার জন্য তাঁরা আর এ গানের প্রতি মনযোগী না হলেও এ গানের প্রতি যে অন্তরের গভীরে অনেক ভালবাসা লুকিয়ে আছে সেটা বোঝা যায়। মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে গিয়ে আরও অসংখ্য মানুষের সন্ধান মেলে যাঁরা ঘাটু গানের আসরে দোহার ও দর্শক-শ্রোতা হিসেবে উপস্থিত থাকতেন। তাঁদের মধ্যে এ গানের জনপ্রিয়তা এখন পর্যন্তও ঠিক আগের মতই কাজ করে। কিন্তু সময় ও সুযোগের অভাবে তারা এর সাথে যুক্ত থাকতে পারেন না। মাঠ পর্যায়ে সমীক্ষার সময় যে বিষয়গুলি স্পষ্ট ভাবে আমি খেয়াল করেছি তার মধ্যে থেকে এ গানের আলোকে সমাজে নারীদের অবস্থান বের হয়ে আসে। আর পুরুষ নারীকে যেভাবে দেখতে চায় সে প্রসঙ্গে আজাদ (২০০১) বলেন,

> পশ্চিমি পুরুষের কাছে সে-ই হচ্ছে আদর্শ নারী, যে সানন্দে মেনে নেয় পুরুষের আধিপত্য, যে আলোচনা না করে পুরুষের চিন্তা ভাবনা মেনে নেয় না, তবে সে নতি স্বীকার করে পুরুষের যুক্তির কাছে, সে বুদ্ধির সাথে পুরুষকে প্রতিহত করে এবং শেষ করে পুরুষের মতে বিশ্বাসী হয়ে। (পৃ: ১৫২-১৫৩)

ঘাটু গানে উপস্থাপিত রাই ও শ্যাম চরিত্রের মধ্যে দিয়ে আমরা মূলত এর প্রতিরূপায়ণ দেখতে পাই। পূর্বে আলোচ্য: আমার উপায় কি সই বলে দেও না / শ্যাম বিচ্ছেদে প্রাণ বাঁচে না- এই গানটি যথার্থ হিসেবে কাজ করে৷ এর পাশাপাশি এ গানের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করি যে নারীর নিকট থেকে পুরুষ বিভিন্ন ভাবে তার সুবিধাবলি আদায় করে নেয়। এ বিষয়ে আজাদ (২০০১) বলেন,

> নারী হচ্ছে সেই সুবিধাপ্রাপ্ত বস্তু, যার মাধ্যেমে পুরুষ পরাভূত করে প্রকৃতিকে। তবে অন্যান্য বস্তুও এ ভূমিকা পালন করতে পারে। কখনো কখনো পুরুষ বালকের দেহে আবার খুজে পেতে চায় বালুকাময় উপকূল, মখমল রাত্রি, মধুমতির সুগন্ধা...যা তার স্ত্রীর একান্ত মানবিক দেহ তাকে দিতে পারে না। (পৃ: ১৩৭)

ঘাটু গানের মধ্যে আমরা এর স্পষ্ট উপস্থিতি দেখতে পাই। *ঘাটু গানের সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট* প্রসঙ্গে আমার গবেষণার অনুকল্প হিসেবে আমি নির্ধারণ করেছিলাম যে, এখানে অভিনেতা তাঁর চরিত্র উপস্থাপনে অতিমাত্রা যুক্ত করেন এবং আর্থ-সামাজিক কাঠামোর দ্রুত পরিবর্তনশীলতা ও আকাশ সংস্কৃতির বিকাশ এর বিলুপ্তির অন্যতম কারণ। মাঠ পর্যায়ে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করে বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে দেখা যায় যে ৪৩ ও ৪৪ নং প্রশ্নের আলোকে ৮৫% তথ্যদাতা এর স্বপক্ষে মতামত তুলে ধরেছেন। অপরদিকে ১৫% তথ্যদাতা এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেছেন। অতএব উক্ত আলোচনার সাপেক্ষে আমরা বলতে পারি যে ঘাটু গানে নারী চরিত্র উপস্থাপনে পুরুষ কুশীলববৃন্দ তাঁদের লিঙ্গ ভিত্তিক আচরণে অতিমাত্রা যুক্ত করেন এবং সমাজের বহুস্তরায়িত সমস্যার দরুন এ গানের সাথে যুক্ত কলাকুশলিরা নিজেদেরকে গুটিয়ে রেখেছেন। আমাদের জন্য চরম দুর্ভাগ্য ও হাতাশার বিষয় এটাই যে, আমারা ঘাটু গানে নারী চরিত্র উপস্থাপনে পুরুষের অংশগ্রহণকে উচু মাপের শিল্প হিসেবে মেনে নিতে পারিনি।

উপসংহার

ঘাটু গান একসময় আমাদের গ্রাম বাংলার মানুষের অস্তিত্বের সাথে মিশে ছিল। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় আজ তা ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। ঘাটু গানের সাথে যৌনতার সম্পর্কের দোহাই দিয়ে এ গানের শিল্পীদের সামাজিক ও পারিবারিক ভাবে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়। যার ফলে তারা নিজেদের ইচ্ছা থাকা স্বত্ত্বেও এ গান থেকে দূরে সরে আছেন। এ গানের প্রতি মানুষের সুদৃষ্টি ফিরে আসলে আমরা বাংলার এক সময়ের ঐতিহ্যবাহী এই লোকজ সংস্কৃতির উপাদানকে পুনর্জ্জীবিত করতে পারি। যে অপবাদ দিয়ে এ গানকে সমাজ থেকে দূরে রাখার অপকৌশল গ্রহণ করা হয় তা আমাদের সমাজের বিভিন্ন মহলে বিভিন্ন ভাবে প্রচলিত, এ সম্পর্কে আমরা সকলেই অবগত। কিন্তু আমরা সেখানে গিয়ে এর প্রতিবাদ করি না। অভিনয় এর পর মানুষের ব্যক্তিক জীবনকে আমরা ভিন্ন করে দেখতে ভয় পাই।

ঘাটু গানের সাথে যাঁরা যুক্ত আছেন তাদের সাথে কথা বলে আমি জানতে পারি যে, তাঁরা শুধু বিনোদনের তাগিদেই মনের খোরাক জোটানোর জন্য এ গানের সাথে যুক্ত আছেন। পূর্বে এ গানের শিল্পীদের সাথে অন্যান্য অভিনেতার অভিনয় বহির্ভূত সম্পর্ক থাকলেও এটা এখন তাঁদের মাথাব্যথার কারণ নয়। তারা শুধু বিনোদনের মাধ্যেম হিসেবে এর সাথে সম্পৃক্ত থাকতে চান। কিন্তু সমাজের মানুষের দৃষ্টি ভঙ্গির কারণে তা হয়ে ওঠে না। তাই আমরা দেখতে পাই যে, চীন ও জাপানের নারী চরিত্র উপস্থানকারী শিল্পীরা তাদের কৈশোর ও যৌবন পদার্পণ করার পর ও একই চরিত্রে অভিনয় করে থাকেন। Tian (2000) এর আলোকে আমরা দেখতে পাই যে, বিখ্যাত অভিনেতা মেই লাং ফাং ৬২ বছর বয়সে প্রধান নারী চরিত্রে অভিনয় করেন৷ তার অভিনয় জীবনের শিক্ষাগুরু চেন ডেলীনও ৫০ বছর এর পর তাঁর অভিনয় জীবনের খ্যাতির চূড়ায় অবস্থান করেন (পৃ: ৮৩)।

কিন্তু আমাদের দেশে ঘাটু গানে আমরা দেখতে পাই যে ১২-১৬ বছরের পর আর নারী চরিত্র উপস্থাপনকারী অভিনেতা অভিনয়ের সাথে যুক্ত থাকেন না। এর মূল কারণ হিসেবে আমি মনে করি যে, নারী চরিত্রে অভিনয় যে বড় মানের শিল্প সেই জায়গাটা আমরা দর্শক ও অভিনেতারা কেউই অনুধাবন করতে পারি না। কিন্তু আমরা যদি একটু সচেতন হই এবং গভীরভাবে চিন্তা করি তাহলে লোকজ সংস্কৃতির এই ধারাটি আবার ফিরে পেতে পারে তার অতীতের ঐতিহ্যমণ্ডিত অবস্থান ।

গ্রন্থপঞ্জি

আজাদ, হুমায়ূন (অনুবাদ) । (২০০১)। *দ্বিতীয় লিঙ্গ- সিমন দ্যা বোভোয়ার*। ঢাকা:আগামী প্রকাশনী।

আজাদ, হুমায়ূন। (১৯৯২) । *নারী*। ঢাকা:নদী।

আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক। (২০১৩, সেপ্টেম্বর ৫)। বাংলা সাহিত্যে নারী [একক বক্তৃতা] । *প্রথম আলো,* পৃ: ৭।

আলীম, ড. আব্দুল। (২০০৮) । *পাবনা অঞ্চলের লোক সংস্কৃতি*। ঢাকা: গতিধারা।

আলম, মহাম্মদ ফয়েজ। (২০০১) । *বাংলা লোক কাহিনীতে বাঙালি সংস্কৃতি* (অপ্রকাশিত এম. ফিল. গবেষণা) । বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

আহমেদ, আফসার। (২০০৯) । ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্য সঙ: বিষয় ও শিল্পের অনুসঙ্গে সমাজ বাস্তবতা । *থিয়েটার স্টাডিজ* (২), ৯–৩৭।

আওয়াল, সাজেদুল। (১৯৯৩) । লোকসংস্কৃতি ও জাতীয় নাট্য আঙ্গিক। অশোক কর্মকার (সম্পাদক), *সাম্প্রতিক শিল্পভাবনা* । (পৃ:৯৭-৯৮) । ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ।

আহমদ, ওয়াকিল। (২০১৪) । *ঘাটু গান*। ঢাকা: গতিধারা।

আহমেদ, ওয়াকিল। (২০০৭) । *ঘাটু লোককলা তত্ত্ব ও মতবাদ*। ঢাকা: গতিধারা।

আহমেদ, আবুল মনসুর। (১৯৬৬) । *বাংলাদেশের কালচার*। ঢাকা: আহমেদ পাবলিশিং হাউজ।

আহমেদ, ইস্রাফিল ও রহমান, লুৎফর। (২০০৫)। তামাশা সঙ যাত্রা ঘাটু ও গীতিকা: একটি তুলনামুলক পর্যবেক্ষণ। *থিয়েটার স্টাডিজ* (২), ৩১-৬৩।

আহমেদ, ওয়াকিল। (১৯৬৯)। *বাংলা লোকসাহিত্যে লোক সংস্কৃতির উপাদান* (অপ্রকাশিত পি. এইচ. ডি. গবেষণা)। বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা।

আহমেদ, ওয়াকিল। (২০০৩)। লোক নৃত্য। সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদক), *বাংলাপিডিয়া বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞান কোষ* (৯ ম খণ্ড, পৃ: ২১৬-২২০) । ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।

আহমেদ, ওয়াকিল। (২০০৭ ক) । লোক নাট্য। সিরাজুল ইসলাম (প্রধান সম্পাদক), *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৭*। *লোক সংস্কৃতি* (পৃ:৬৮-৮০) । ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি। সিরাজুল ইসলাম ১

আহমেদ, ওয়াকিল। (২০০৭ খ)। লোক নৃত্য। সিরাজুল ইসলাম (প্রধান সম্পাদক), *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৭*। *লোক সংস্কৃতি* (পৃ:৮১-৯৮) । ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।

আহমেদ, সৈয়দ জামিল। (১৪০০)। নাট্যাভিনয়ে নারী কুশীলব এবং বাংলার দেশজ নাট্যের প্রাসঙ্গিক ইতিহাস। *সাহিত্য পত্রিকা৩৭*,(২), ১২৯-১৪৩।

আহমেদ, হুমায়ূন (নির্দেশক)। (২০১২)। *ঘেঁটু পুত্র কমলা* [চলচ্চিত্র]। বাংলাদেশ: ইমপ্রেস টেলিফিল্ম।

ইমাম, জাহানারা। (১৯৯২)। *ঢাকা মহানগরী নাট্য চর্চা*। ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি।

ইলিয়াস, মাহাবুব। (১৯৯৯)। *লোককসাহিত্যে ছড়ানাট্য ও লোকসঙ্গীত*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

ইসলাম, আহমেদ আমিনুল। (২০১০)। *ময়মনসিংহের ঐতিহ্যবাহী নাট্য গঠন ও পরিবেশনা রীতি*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

ইসলাম, মজহারুল। (১৯৬৭)। *ফোকলোর পরিচিতি ও লোক সাহিত্যের পঠন-পাঠন*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

উদ্দিন, মোহাম্মদ মফিজ। (১৯৯৯)। *ব্রাহ্মণ বাড়িয়ার লোকসাহিত্যে সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাসের উপাদান* (অপ্রকাশিত পি. এইচ. ডি.গবেষণা)। বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

উমর, বদরুদ্দীন (সম্পাদক)। (২০০৩)। *নারী প্রশ্ন প্রসঙ্গে*। ঢাকা: শ্রাবণ প্রকাশনী।

ওয়াহাব, আবদুল। (২০০৭ ক)। *বাংলাদেশের লোকগীতি একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যায়ন* (১ম খণ্ড)। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

ওয়াহাব, আবদুল। (২০০৭ খ)। *বাংলাদেশের লোকগীতি একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যায়ন* (২য় খণ্ড)। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

কাশিমপুরী, মহাম্মদ সিরাজুদ্দীন। লোক- সাহিত্যে গাঁড়ু গান। *বাংলা একাডেমি পত্রিকা, ৫*(২), ৫৮-৭৪।

কবির, মোঃ জাহিদুল। (২০০৯)। ত্রিশালে ঘাটু গান। *শিল্পকলা মষান্মাসিক বাংলা পত্রিকা ১৭*(২), ১৬–৩৩।

করিম, মোঃ আস্রাফুল। (২০০৯)। সিলেটের নৃ-গোষ্ঠী চা শ্রমিকদের নৃত্য বৈচিত্র: একটি পর্যবেক্ষণ। *বাংলা একাডেমি পত্রিকা, ৫৩*,(৪-৩) ৬৯-৮০।

খাতুন, শাহিদা। (২০০৩)। ঘাটু গান। সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদক), *বাংলাপিডিয়া বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞান কোষ* (৩য় খণ্ড, পৃ: ২৫৪-২৫৫)। ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি।

খান, জলিল (সম্পাদক)। (২০০৩)। *জামালপুরের পালাগান*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

খান, প্রিন্স রফিক। (২০০৭)। কিশোরগঞ্জ জেলার লোক সঙ্গীত। সিরাজুল ইসলাম (প্রধান সম্পাদক), *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-১০। লোক সঙ্গীত* (পৃ:২১০-২২৩)। ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।

খান, শামসুজ্জামান (প্রধান সম্পাদক)। (২০১৩)। *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা- ময়মনসিংহ*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

খান, সামসুজ্জামান (সম্পাদক)। (২০১০)। *বাংলা একাডেমী ফোকলোর সংগ্রহমালা ১০ পালাগানঃ সিলেট*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

খান, সামসুজ্জামান। (২০০১)। *আধুনিক ফোকলোর চিন্তা*। ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী।

চক্রবর্তী, সুদীপ। (২০০৮)। শিব-গৌরীর গীত : বাংলার একটি কৃত্যনাট্য। *বাংলা একাডেমি পত্রিকা, ৫২*(১), ১২৯-১৩০।

চক্রবর্তী, বরুণ কুমার (সম্পাদক)। (১৯৯৯)। *বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস*। কলকাতা: নয়ামুদ্রণ।

চক্রবর্তী, বরুণ কুমার (সম্পাদক)। (১৯৯৫)। *বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ*। কলকাতা: অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স।

চৌধুরী, আবুল আহসান। (১৯৯৭)। *লোকসংস্কৃতি বিবেচনা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

চৌধুরী, মোমেন। (১৯৯৭)। *লোকসংস্কার ও বিবিধ প্রসঙ্গ*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

জাকারিয়া, সাইমন। (২০০৮)। *বাংলাদেশের লোকনাটক বিষয় ও আঙ্গিক-বৈচিত্র্য*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

জাকারিয়া, সাইমন। (২০০৮)। বাংলাদেশের ভ্রাম্যমান পরিবেশনা শিল্প। ওয়াহাব, আব্দুল (সম্পাদক), *বাংলাদেশের লোকঐতিহ্য* (২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ৩১১-৩৩০)। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

জাহান, ইফফাৎ। (২০১০)। *সিলেটের অর্থনীতি ও সমাজ*। ঢাকা: উৎস প্রকাশন।

জাহান, সৈয়দা খালেদা। (২০০৩)। *বাংলাদেশের নাটকে রাজনীতি ও সমাজ সচেতনতা*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

জলিল, মোঃ আবদুল। (১৯৯৩)। *লোকসাহিত্যের নানা দিক*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

তালুকদার, শফিউদ্দিন। (২০০৭)। টাঙ্গাইল জেলার লোক সঙ্গীত। সিরাজুল ইসলাম (প্রধান সম্পাদক), *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-১০। লোক সঙ্গীত* (পৃ:২৩৪-২৪২)। ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।

দীন, ড. সেলিম আল। (১৯৯৬)। *মধ্যযুগের বাংলা নাট্য*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

দুলাল, ফরিদ আহমেদ। (২০০৭)। ময়মনসিংহ জেলার লোক সঙ্গীত। সিরজুল ইসলাম (প্রধান সম্পাদক), *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-১০ / লোক সঙ্গীত* (পৃ:২৪৩-২৬৫)। ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।

নাঈম, রসদি; রহমান ও অন্যান্য (পরিকল্পনা ও গ্রন্থনা)। (২০১০)। *তামশা*। নেত্রকোনা: আই কর্ণার।

নাহার, কামরুন। (২০০৮)। *বাংলা লোক গীতিকায় নারী* (অপ্রকাশিত এম. ফিল. গবেষণা)। বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

পাঠান, মহাম্মদ হাবিবুল্লাহ (সম্পাদক)। (১৯৯৬)। *বাংলাদেশের লোক কাহিনী*। নরসিংদী: গ্রন্থ সুহৃদ প্রকাশনী।

ফেরদৌস, শবনম (প্রযোজক)। (২০১২)। ঘাটু গান [গানের অনুষ্ঠান]। ৭১ টেলিভিশন প্রযোজিত *গানের টানে*। ঢাকা: ৭১ টেলিভিশন।

ব্রহ্ম, তৃপ্তি। (১৯৮৯)। *লোক জীবনে বাংলার লৌকিক ধর্মসঙ্গীত ও ধর্মীয় মেলা*। কলকাতা: ফার্মা কে এল এম প্রা: লিমিটেড।

বন্দ্যোপাধ্যায়, ড সুরেশচন্দ্র (সম্পাদক)। (১৯৮২)। *ভরত নাট্যশাস্ত্র*। কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন।

বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেশ্বর। (১৯৯৬)। *বাংলাদেশের সঙ প্রসঙ্গে*। কলকাতা: মনীষা গ্রন্থালয়। প্রকাশনা কে সেটা নিশ্চিত হতে হবে।

ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ। (২০০৬)। ধর্ম পুজার ইতিহাস-ধর্মমঙ্গল কাব্য-ধর্মমঙ্গলের কবিগণ। *বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস* (পৃ ৫০১-৫৮১)। কলকাতা: রাজিব নিয়োগী।

ভট্টাচার্য, শরদিন্দু। (১৯৯৫)। *সিলেটের লোকগীতি ও লোকনাট্যে লোকজীবন* (অপ্রকাশিত এম. ফিল. গবেষণা)। বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার।

ভূঁইয়া, মেসবাহ উদ্দিন। (১৯৭৭)। *বিদ্রোহী কবি*। ঢাকা: আলী প্রকাশনী।

মিঞা, মোঃ আবদুল করিম। (২০০১)। *টাঙ্গাইলের লোকসঙ্গীত*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

মোমেন, আমিরুল। (১৯৯৪)। *উত্তরাধিকার রচনাসূচি, (১৯৭৩-১৯৯২)*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

মোমেন, আমিরুল। (১৯৯৫)। *বাংলা একাডেমী পত্রিকা সূচিপত্র (১৩৬৩-১৪০০)*। ঢাকা: বাংলা এ একাডেমি।

মজুমদার, কেদারনাথ। (১৯০৪)। *ময়মনসিংহের বিবরণ*। কলকাতা: স্যানাল এন্ড কোং।

মৈশান, শাহমান। (২০১২)। বাংলাদেশের লোকনাট্য: পদ্ধতিগত পঠন এবং আধুনিকতাবাদ প্রত্যাখানের রাজনীতি। *বাংলা একাডেমি পত্রিকা, ৫৫*(৩-৪), ১৯৯-২০০।

রাজী, আলিম আল। (২০১০)। *বাংলা লোকনাট্য পালা গান প্রকৃতি ও প্রয়োগ*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

রায়, অসিত। (২০০০)। সঙ্গীত ও প্রকৃতি। *শিল্পকলা ষাণ্মাসিক পত্রিকা, ১৯-২০*(২-১)। ৯৭-১০২

রায়বাহাদুর, শ্রী দীনেশ চন্দ্র সেন (সম্পাদক)। (১৯৯৭)। *মৈমনসিংহ গীতিকা পূর্ব বঙ্গ গীতিকা* -(১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা)। ভারত: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

রহমান, আতাউর। (১৯৯৫)। *নাট্য প্রবন্ধ বিচিত্রা*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

রহমান, মাহফুজুর। (২০১১)। বাংলাদেশের লোক নৃত্য। *শিল্পকলা ষান্মাসিক বাংলা পত্রিকা২৯* ,(২), ৩৫–৫৩।

রহমান, লুলু আব্দুর। (২০০৭)। জামালপুর জেলার লোক সঙ্গীত। সিরাজুল ইসলাম (প্রধান সম্পাদক), *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-১০। লোক সঙ্গীত* (পৃ:২২৪-২৩৩)। ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।

সিদ্দিকী, ড আশরাফ। (১৯৯২)। বাংলাদেশের লোক সংস্কৃতি। *শিল্পকলা ষাণ্মাসিক বাংলা পত্রিকা,* ১৬(২)। ৭৭-৮১।

সরকার, যতীন। (১৯৮৮)। *সিরাজুদ্দিন কাশিমপুরী*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

সরকার, সঞ্জয়। (২০১২, মে ২৫)। ঐতিহ্যবাহী ঘাটু গান। *দৈনিক ইত্তেফাক,* পৃ: ২৭।

সরকার, সন্তোষ। (২০০২)। নেত্রকোনার লোকজ সংস্কৃতির ঐতিহ্য ঘাটু গান। স্বপন পাল (সম্পাদক), *নেত্রকোনার লোক জগত* (পৃ: ৯-১৩)। নেত্রকোনা: স্বাবলম্বী উন্নয়ন সমিতি।

হক, কাজী ইমদাদুল। (২০০৫)। *নেত্রকোনা মুখশ্রী*। ঢাকা: নেত্রকোনা জেলা সমন্বয় পরিষদ।

হক, মহাম্মদ এনামুল। (২০০৬)। লোক সাহিত্য। শামসুজ্জামান খান (সম্পাদক), *বাংলাদেশের ঐতিহ্য* (১ম খণ্ড, পৃ: ৩-২১)। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

হক, সৈয়দ আজিজুল। (১৯৮৮)। *মৈমনসিংহের গীতিকাঃ জীবন ধর্ম ও কাব্য মূল্য* (অপ্রকাশিত এম. ফিল. গবেষণা)। বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যাল, ঢাকা।

হাবিব, রহমান। (২০০৯)। *বাংলা গানের ভাব সম্পদ*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

হাসান, শেখ মেহেদী। (২০০৭)। লোকনৃত্য। সিরাজুল ইসলাম (প্রধান সম্পাদক), *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা খণ্ড ১২ / পরিবেশনা শিল্পকলা* (পৃ: ৪৬৪-৪৭৩)। ঢাকা বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।

হোরাস। (২০১০)। বাচ্চা বাজি (bacha bazi): আফগানিস্থানে প্রচলিত বিকৃত শিশু (যৌন) নির্যাতনের সংস্কৃতি। *আমার ব্লগ. কম,* প্যারা ১-৫।

হোসেন, মোঃ মোতাহার। (২০০৯)। *রংপুর ও সিলেট গিতীকায় বিধৃত সমাজ ও সংস্কৃতি*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

Ahmed, Syed Jamil. (2000). *Achinpakhi infinity indigenous theatre of Bangladesh*. Dhaka: The University press limited.

Ault, Thomas. (2012).Tonight Amar Singh Rathore:Marwari Khyal in transition. *Asian Theatre Journal, 8* (2), 142-167. Retrieved 10 July, 2012, from http://www.jstor.org/stable/1124540.

Barba, Eugenio & Sarese, Nicola. (1991). *A dictionary of theatre Anthropology, The secret art of the performer.* London: Routledge .

Brockett, Oscar G. (1974). *The theatre an introduction*. United States of America: Library of Congress Cataloging in Publication Data.

Diamond, Catherine. (2012). Fire in the banana's belly: Bali's female performers essay the masculine Arts*. Asian Theatre Journal, 25*(2), 231-271. Retrieved 10 July, 2012, from http://www.jstor.org/stable/27568453.

Doran, Jamie (director). (2010). *The dancing boys of Afganisthan*. Boston: PBS. Retrieved 06 October, 2013, from

http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/dancingboys/

Mahmud, Firoz. (1993). *Prospectus material folk culture studies and folklife museums in Bangladesh*. Dhaka: Bangla Academy.

Pitkow, B. Marlene. (2012). Putana's salvation in Kothakali: Emboding the sacred journey. *Asian Theatre Journal,18*(2), 238-248. Retrieved 10 July, 2012, from http://www.jstor.org/stable/1124154.

Ritzer, George. (1992). *Sociological theory*. U.S.A: McGrahill.

Tian, Min. (2012). Male Dan: The paradox of sex, acting, and perception of female impersonation in traditionalChinese theatre*. Asian Theatre Journal, 17*(1), 78-97. Retrieved 10 July, 2012, from http://www.jstor.org/stable/1124205 .

Tong, Rosemarie Putnam (1998). *Fiminist theory*. U.S.A: Westview Press.

Valocchi, Stephen .(2012). Not yet queer enough: The lessons of Queer theory for the sociology of gender and sexuality*. Gender and Society, 19*(6), 750-770. Retrieved 10 July, 2012, from http://www.jstor.org/stable/27640849.

Zakaria, Saymon. (2011*). Pronomohi Bongomata.* Dhaka: Nymphea publication.

The End.